২১-২২ দুই খন্ড একত্রে

মৃত্যুর কবলে

নূরী

বেলাল
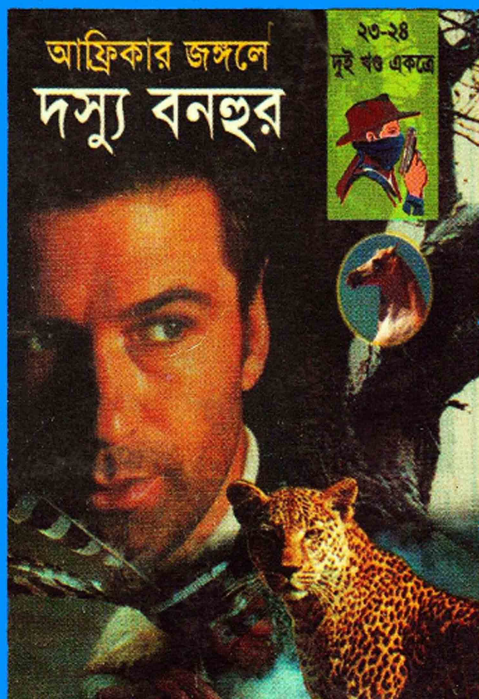
মৃত্যুর কবলে নূরী-২১
বনহুরের অন্তর্ধান-২২

দুই খণ্ড একত্রে

রোমেনা আফাজ

পরিবেশক

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

বাদল ব্রাদার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলা বাজার
ঢাকা-১১০০।

নতুন সংস্করণ ঃ অক্টোবর ১৯৯৭ ইং

মূল্য ঃ ৩০.০০ টাকা মাত্র।

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ বি, কে, দাস রোড
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০।

আমার প্রান প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরনা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

বনহুর নূরীর রক্তমাখা দেহটার দিকে একবার তাকিয়ে ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় সোজা হয়ে দাঁড়ালো, দক্ষিণ হস্তে তার উদ্যত রিভলভার। পকেটে এখনও যথেষ্ট গুলী মজুত রয়েছে।

ভোলানাথ দলবল সহ এগিয়ে আসতেই বনহুরের হস্তস্থিত রিভলভার গর্জন করে উঠলো। অব্যর্থ গুলী বনহুরের— সঙ্গে সঙ্গে ভোলানাথের একজন প্রিয় অনুচর আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো ভূতলে।

ভোলানাথ বা তার দলবলের তখন কোনো দিকে ফিরে তাকাবার সময় নেই। শিকারের লালসায় রক্তলোভী জানোয়ার যেমন উগ্র হয়ে উঠে, তেমনি দ্রুত ছুটে চললো ওরা বনহুরের দিকে।

বনহুর মূহূর্তে বিলম্ব না করে পরপর গুলী ছুড়তে লাগলো। প্রত্যেকটা গুলীর আঘাতে ভোলানাথের সঙ্গীগণ ধরাশায়ী হতে লাগলো। সুচতুর ভোলানাথ কৌশলে তার দলবলের মধ্যে আত্মগোপন করে নিজকে বাঁচিয়ে নিতে লাগলো।

নিজেও ভোলানাথ ও তার সঙ্গীগণ বনহুরকে লক্ষ্য করে তীর এবং ছোড়া নিক্ষেপ করতে লাগলো।

বনহুর গাছের গুড়ির আড়ালে কখনও বা টিলার পাশে নিজকে আড়াল করে শত্রুপক্ষের অস্ত্র থেকে নিজকে রক্ষা করছিলো। মুহূর্তে মুহূর্তে বনহুরের রিভলভার গর্জন করে উঠছিলো।

ওদিকে ভোলানাথের দলের অস্ত্র-নিক্ষেপের বিরাম ছিলোনা।

বনহুর একা আর ভোলানাথের দলে প্রায় বিশ জনেরও বেশি হবে। তবু ভোলানাথের দল বনহুরের রিভলভারের কাছে টিকে উঠতে পারছিলোনা। বনহুর আজ ভয়ঙ্করের চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে, সিংহের চেয়েও হিংস্র।

নূরীর মৃত্যু তাকে উম্মাদ করে তুলেছে!

বনহুর শত্রুর সঙ্গে লড়াই এর জন্য প্রস্তুত হয়েই কান্দাই থেকে রওয়ানা দিয়েছিলো, কাজেই রিভলভার এবং অফুরন্ত গুলী সে সঙ্গে নিয়েই এসেছিলো। এই মুহূর্তে বনহুরের সম্বল তার রিভলভারখানা।

ভোলানাথের দল যতই দুর্দ্দান্ত হোক বনহুরের রিভলভারের কাছে নাজেহাল হয়ে পড়লো, এক এক করে অনেকগুলি ধরাশায়ী হলো ভূতলে। রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো আরাকান জঙ্গলের মাটি!

সেকি ভীষণ যুদ্ধ।

বনহুর টিলার পাশে আত্মগোপন করে অবিরাম গুলী চালাচ্ছে। কখনও বা গাছের গুড়ির আড়ালে, কখনও বা ঝোপ-ঝাড় আর আগাছার অন্তরালে।

মুহূর্তে মুহূর্তে প্রকম্পিত হয় উঠছে বনভূমি বনহুরের রিভলভারের গুলীতে।

আর বেশিক্ষণ টিকে উঠতে পারলো না ভোলানাথের দল, তারা জীবনে বহুজনকে যুদ্ধে পরাজিত করে আরাকানের মাটি লালে লাল করে দিয়েছে, আজ হলো তাদের পরাজয়।

প্রায় তিন ভাগ দুশমন নিঃপাত করে বনহুর হাঁপাতে লাগলো। রিভলভারের গুলীর সংখ্যাও কমে এসেছে অনেক। বনহুর এখন অনেক সাবধানে গুলী চালাচ্ছে। একটি গুলী যেন তার নষ্ট না হয়।

ইতিমধ্যে ভোলানাথের এক অনুচরের গুলীতে বনহুরের বাম স্কন্ধের খানিকটা মাংস কেটে রক্ত ঝরছিলো।

বনহুর ললাটের ঘাম বাম হস্তের পিঠে মুছে নিয়ে প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগলো। কাঁধের মাংস কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে— সেদিকে তার খেয়াল নেই। গুলীর পর গুলী নিক্ষেপ করে চলেছে সে। বনহুরের সুন্দর মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে উঠেছে, দাঁতে অধর চেপে গুলী ছুড়ছে।

ভোলানাথের দলের অস্ত্র নিক্ষেপেরও বিরাম নেই। তারা সংখ্যায় যত কমে আসছে ততই যেন আরও বেশি হিংস্র হয়ে উঠছে। ক্রুদ্ধ জানোয়ারের মতো বনহুরকে হত্যা করবার জন্য ক্ষেপে উঠেছে।

ভোলানাথ স্বয়ং তীর নিক্ষেপ করছে, চোখ দিয়ে যেন অগ্নি শিখা নির্গত হচ্ছে তার। বিরাট দেহটা দুলে দুলে উঠছে ভয়ঙ্কর রাক্ষসের মত। মাথায় একরাশ চুল সজারুর কাটার মত হয়ে উঠেছে, সেকি ভীষণ চেহারা তার!

বনহুর মরিয়া হয়ে গুলী ছুড়ছে, কিন্তু আশ্চর্য—এতো লক্ষ্য করে গুলী ছুড়েও ভোলানাথের শরীরে একটি গুলীও বিদ্ধ করতে পারছে না সে।

ভোলানাথের সঙ্গীরা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, মাত্র কয়েকজন এখনও বিপুল উদ্যমে লড়াই করছে। কিন্তু আর বেশিক্ষণ তারা বনহুরের রিভলভারের মুখে টিকতে পারবে বলে মনে হয় না। ভোলানাথের দলের অস্ত্র নিঃশেষ হয়ে এসেছে। এবার ভোলানাথ তার দলবলের মনোভাব বুঝতে পারলো, অস্ত্রশূন্য হয়ে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে আত্মগোপন করাই শ্রেয় মনে করলো বুঝি ভোলানাথ।

বনহুরের রিভলভার থেকে তখনও অবিরাম গুলী বর্ষণ হচ্ছে; তবে তার পকেটেও আর গুলীর সংখ্যা বেশি নেই। বনহুর এখন অত্যন্ত সাবধানের সঙ্গে গুলী নিক্ষেপ করছে। একটি গুলীও যেন ব্যর্থ না হয়।

হঠাৎ বনহুর এবার লক্ষ্য করলো, ভোলানাথ তার দলবল ত্যাগ করে কোথায় উধাও হয়েছে। সামান্য কয়েকজন লোক তখনও তীর-ধনু আর ছোরা নিয়ে ছুটোছুটি করছে। বনহুরকেই যে তারা অনুসন্ধান করছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ইচ্ছা করলে এই মুহূর্তে বনহুর সব ক'টাকে এক এক করে যমালয়ে পাঠাতে পারে কিন্তু ওদের হত্যা করে কোনো লাভ হবে না, আসল শিকার অন্তর্ধান হয়েছে। তবু ওদের না সরানো পর্যন্ত বনহুর নূরীর মৃতদেহের পাশে যেতে পারছে না। বনহুর পরপর আরও দুজনাকে ধরাশায়ী করে ফেললো।

সঙ্গীদের এই পরিণতি দেখে অন্যান্য কয়েকজন আরাকান গুণ্ডা এবার ঝোপ-ঝাড় অতিক্রম করে পালাতে শুরু করলো।

বনহুর আর একদণ্ড বিলম্ব না করে ছুটে চললো যেখানে পড়ে আছে নূরীর তীরবিদ্ধ দেহটা।

কিন্তু কি আশ্চর্য! যেখানে নূরীর লাশটা পড়ছিলো সেখানে কিছু নেই, শুধু জমাট বেঁধে আছে নূরীর বুকের তাজা রক্ত।

বনহুর ধপ্ করে বসে পড়লো মাটিতে, জমাট বাধা রক্ত মুঠোয় চেপে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলো, ঠিক্ ছোট্ট বালকের মতো। জীবনে বুঝি সে এমনভাবে কোনোদিন রোদন করে নি।

আজ বনহুর নূরীর অভাব অন্তর দিয়ে অনুভব করলো। বুকের মধ্যে অসহ্য একটা হাহাকার গুমড়ে উঠলো তার। কিছুক্ষণ আগের নূরীর সেই হাসোজ্জ্বল সুন্দর মুখখানা ভেসে উঠতে লাগলো তার মানসপটে। কাজল কালো দুটি চোখে অপূর্ব ভাবময় চাহনী। সরু গোলাপ পাপড়ীর মত দুটি ঠোঁটের ফাঁকে মিষ্টি মধুর হাসি। বনহুর আজ সমস্ত অন্তর দিয়ে নূরীর অপরূপ সৌন্দর্য অনুভব করেছিলো, উপলব্ধি করেছিলো তাকে। নূরীকে আজ বনহুর পেয়েছিলো একান্ত আপন করে। কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি যে তাকে হারাতে হবে ভাবতেও পারেনি বনহুর কোনো সময়ের জন্য।

অবুঝ বালকের মতো কাঁদতে লাগলো বনহুর, ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো তার গণ্ড বেয়ে। কেউ নেই আজ তাকে সান্ত্বনা দেবার, কেউ নেই তার পাশে এসে দাঁড়াবার।

কতক্ষণ বনহুর স্তব্ধ হয়ে বসেছিলো খেয়াল নেই, হঠাৎ একটা হিংস্র গর্জনে ফিরে তাকালো বনহুর, সঙ্গে সঙ্গে রিভলভার উদ্যত করে ধরলো সে।

বনহুরের নিকট হতে কয়েক গজ দূরে একটা বিরাট সিংহ ভয়ঙ্কর মুখ-গহ্বর বিস্ফারিত করে দাঁড়িয়ে আছে, আর এক মুহূর্ত—তাহলেই পশুরাজ তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বনহুর দ্রুত হস্তে রিভলভারখানা বের করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো; সঙ্গে সঙ্গে একটি গুলী গিয়ে বিদ্ধ হলো পশুরাজের বুকে।

ভীম গর্জন করে সিংহটা লাফিয়ে পড়লো বনহুরের পাশে। বনহুর অতি কৌশলে নিজেকে সরিয়ে নিলো দূরে।

সিংহরাজ আর দাঁড়াতে পারলো না, মুখ থুবড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো।

বনহুর এগিয়ে এলো পশুরাজের মৃতদেহের পাশে। একটি মাত্র গুলীই বনহুরের রিভলভারে শেষ সম্বল হিসাবে ছিলো; তাই আজ এই মুহূর্তে বনহুরকে বাঁচিয়ে নিলো। কিন্তু এ বাঁচায় তার আনন্দ হলোনা, বিপদ কেটে যাওয়ায় আবার নতুন করে নূরীর শোক তার হৃদয়ে দগ্ধীভূত করে চললো। বনহুরের দৃষ্টি নূরীর মৃতদেহের সন্ধানে চারিদিকে ঘুরে ফিরতে লাগলো। কিন্তু কোথায় নূরী! হঠাৎ বনহুর লক্ষ্য করলো—সিংহরাজের মুখ-গহ্বর তাজা রাঙা হয়ে রয়েছে। তবে কি নূরীর মৃতদেহটা পশুরাজের উদরে স্থান লাভ করেছে? হয়তো তাই হবে, নূরীর মৃতদেহটা তো আর পঁচে যায়নি—সম্পূর্ণ টাটকা লাশ ছিলো ওটা, কাজেই পশুরাজের ভক্ষণে কোন অসুবিধাই হয়নি। নূরীর শেষ পরিণতি চিন্তা করে বনহুরের হৃদয় বিদীর্ণ হলো।

সেদিনের পর থেকে বনহুরের হৃদয় মধ্যে এলো একটা পরিবর্তন। যে নূরীকে সে কয়েকমাস আগে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলো আজ সেই নূরীর জন্য সর্বহারা রিক্তের মত বনে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। আজ বনহুর যেন তার সর্বস্ব হারিয়ে ফেলেছে, সব যেন লুট হয়ে গেছে তার। উষ্ক-শুষ্ক চুল, মলিন মুখমণ্ডল, অবশ শিথিল দেহ, মন্থর পদক্ষেপে চলছিলো—কোথায় যাচ্ছে, কেনো যাচ্ছে, সে নিজেই জানে না। দৃষ্টি উদাস-করুণ বেদনা ভরা।

বনহুর আজ সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করছে নূরী তার হৃদয়ের কতখানি অধিকার করে নিয়েছিলো। নূরীর প্রেম-ভালবাসাকে সে চিরদিন উপেক্ষাই করে এসেছে, কোনোদিন তার প্রতি এতোটুকু সহানুভূতি পর্যন্ত দেখায় নি বনহুর। কেনো, নূরী কি তাকে কিছু দিয়েছিলো না? নূরীই তো তার জীবনের প্রথম কল্পনার রাণী। নূরীর ভালবাসাই তার জীবনে এনেছিলো প্রথম প্রেম। তাকেই তো প্রথম হৃদয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করেছিলো সে। নূরীর মৃত্যুর পর থেকে সেই হয়েছে তার ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন-সাধনা। সেদিনের

পর থেকে বনহুর সব সময়ের জন্য এই বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটি বারের জন্য ত্যাগ করতে পারে নি সে এই আরাকান জঙ্গল। সারাটা দিন বনে বনে ঘুরে বেড়ায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো, চারিদিকে কি যেন খুঁজে ফেরে, কাকে যেন অন্বেষণ করে সে।

ক্ষুধা-পিপাসা সব যেন উবে গেছে ভুলে গেছে বনহুর সমস্ত দুনিয়াটাকে। যেখানে বসে সেখানে বসেই থাকে— প্রাণহীন অসাড়ের মতো।

নূরীকে সে এতোখানি ভালবেসেছিলো নিজেই বুঝতে পারেনি। কোনোদিন। নূরীকে হারিয়ে ভুলে গেছে বনহুর তার নিজের অস্তিত্ব।

বনহুর সমস্ত আরাকান জঙ্গলে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। ঝোপ-ঝাড় বন সব নিপুণ দৃষ্টি মেলে দেখেছে কিন্তু কোথাও নূরীর সন্ধান পায় নি।

একটা গাছের তলায় এসে বসলো বনহুর। আজ ক'দিন সম্পূর্ণ উপবাসী সে। ক্ষুধা- পিপাসা তার হয়েছে কিন্তু উপলব্ধি করতে পারে নি। সম্মুখে বৃক্ষ ভরা কত সুস্বাদু ফল, ঝরণা ভরা স্বচ্ছ জল, বনহুর ইচ্ছা করলে এ সবে ক্ষুধা নিবারণ করতে সক্ষম হতো, কিন্তু তার মনে কোন সময় এ সব চিন্তা আশ্রয় পায়নি।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো— আবার ফিরে এলো সে যে স্থানে নূরী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে, যেখানে নূরীর মৃতদেহটা পড়েছিলো বনহুর সেই স্থানে এসে দাঁড়ালো, নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো নিস্পলক নয়নে.... হঠাৎ বনহুরের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠলো একখানা মুখ, সে মুখখানা আর কারো নয়— নূরীর।..... ঐ তো নূরী বসে আছে। সেও তাকিয়ে আছে তার দিকে। সুন্দর মুখমণ্ডলে বিষণ্ণতার ছাপ, চোখে করুণ চাহনী। ঠোঁট দু'খানা শুকিয়ে গেছে কেমন যেন রক্তশূন্যতার মতো। চুলগুলো এলোমেলো বিক্ষিপ্ত-কপালে-ঘাটে পিঠে ছড়িয়ে আছে। বনহুর ওর দিকে তাকিয়ে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো— নূরী—নূরী—দু'হাত প্রসারিত করে ছুটে গেলো ওকে জাপটে ধরতে, কিন্তু কোথায় নূরী— সব শূন্য, সব ফাঁকা।

বনহুর ধপ্ করে বসে পড়লো ভূতলে, দু'হাতে মাথার চুল টেনে ছিড়তে লাগলো, ডুকরে কেঁদে উঠলো— নূরী—নূরী তুমি কোথায়...... কোথায়.....

এমনি শুধু আজ নয়, আরও কতদিন বনহুর ছুটে এসেছে এইখানে, দেখতে পেয়েছে সে নূরীকে— ধরতে গেছে সে, কিন্তু ধরতে পারেনি, কোথায় হারিয়ে গেছে আলেয়ার আলোর মত বাতাসের বুকে।

বনহুর মাথার চুল টেনে ছিড়ছিলো , অধর দংশন করছিলো। নূরীর অন্তর্ধান তাকে যেন পাগল করে দিয়েছে।

❑

মনিরা রহমানের গলা জড়িয়ে ধরে বলে— কাক্কু, আমার বাপ্পি তো আর এলোনা?

বনহুরের আগমন প্রতিক্ষায় রহমান প্রহর গুণছিলো মনির মনেই শুধু চিন্তা জাগেনি, বনহুরের জন্য রহমানের মনটাও কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো। সেইদিনের পর রহমান আর আরাকান জঙ্গলে যায়নি। বনহুর আর নূরীর মিলন তার মনে যেমন আনন্দ বয়ে এনেছিলো, তেমনি তার হৃদয় ভরে উঠেছিলো শূন্যতার হাহাকারে।

নূরীকে রহমান অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিলো, সমস্ত প্রাণ ভরে সে কামনা করতো ওকে। কিন্তু নূরীর দিক থেকে কোনোদিন সে পায়নি এতোটুকু আশ্বাস। রহমান নূরীকে ভালোবেসে শুধু দীর্ঘনিশ্বাসই বহন করেছে, কোনোদিন তাকে একান্ত আপন করে পায়নি। ওকে না পাবার বেদনা রহমানের মনে দাহ সৃষ্টি করেছে কিন্তু সান্ত্বনার প্রলেপ সে পায়নি। তাই রহমান সেদিন নূরীকে তার অন্তর থেকে বিদায় দিয়েছিলো, যদিও হৃদয়টা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিলো তবু সে নূরীকে তুলে দিয়েছিলো তার প্রিয় সর্দারের হাতে।

রহমানের চোখ দুটি তখন শুষ্ক ছিলোনা, বনহুর বা নূরী কেউ লক্ষ্য করলে দেখতো সে আঁখি দুটিতে কি অসহ্য বেদনা ফুটে উঠেছিলো। সেদিন নূরীকে শেষ বারের মতো বিদায় দিয়েছিলো রহমান তার মনের গহন থেকে।

আজ মনি না বললেও রহমানের মনে সব সময় সর্দার আর নূরীর কথা জেগেছিলো— মুখে ব্যক্ত না করলেও অন্তরে সদা-সর্বদা একটা তুষের আগুনের মতো কুণ্ডলি গুমড়ে জ্বলছিলো।

সেদিন রহমান আরাকান জঙ্গল থেকে শহরে ফিরে এসে কিছুতেই মনস্থির করতে পারছিলোনা। প্রাণ-প্রতিমাকে বিসর্জন দিয়ে পূজারী যেমন শূন্য কুটিরে ফিরে আসে তেমনি অবস্থা হয়েছিলো রহমানের। নূরীকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে রহমান কাতর হলেও ভেংগে পড়েনি। আজ যদি নূরীকে সর্দারের হাতে সমর্পণ না করে অন্য কেউ গ্রহণ করতো, তাহলে রহমান তাকে কিছুতেই ক্ষমা করতো না।

রহমানকে গভীরভাবে চিন্তা করতে দেখে বলে মনি— কি ভাবছো কাক্কু? আমার বাপি আর আসবেনা?

রহমানের সম্বিৎ ফিরে আসে, বলে সে— আসবে। আসবে মনি। কিন্তু.....

কিন্তু কি কাক্কু?

এতোদিন এলোনা কেনো তাই ভাবছি।

হয়তো কোনো কাজে আটকা পড়ে গেছে। কাক্কু তুমি যাও, আমার বাপিকে নিয়ে এসো।

কিন্তু........

আবার কিন্তু কেনো?

যদি না আসে? আসবে। নিশ্চয়ই আসবে। কাক্কু, তুমি না বলেছিলে মাম্মিও আছে বাপির সঙ্গে?

হাঁ? মনি, সেও আছে তার সঙ্গে।

যাওনা, কাক্কু, আমার বাপি আর মাম্মিকে নিয়ে এসোগে।

যেতে হবেনা, তাদের সময় হলে এমনিই চলে আসবে।

তুমিতো আরও কতো দিন বলেছো, তারা চলে আসবে কিন্তু আজও তো এলোনা? আজ আমি কিছুতেই শুনবোনা, কাক্কু তোমাকে যেতেই হবে।

বেশ, আমি তাদের আনতে যাবো, তুমি স্কুলে যাও।

যাবো, এসে যেন বাপি আর মাম্মিকে দেখতে পাই।

পাগল ছেলে, যেখানে তোমার বাপি আর মাম্মি আছে সে স্থান যে অনেক দূরে, তুমি স্কুল থেকে ফিরেও বাড়ীর বুড়িমার কাছে থাকবে। বুড়ি-মা ওরফে খালার কথাই বললো রহমান মনির কাছে।

খালা পাশের বাড়ীর একটি বিধবা প্রৌঢ়া মহিলা। শুধু রহমানই নয়, এ পাড়ার অনেকেই তাকে 'খালা' বলে ডাকে। মহিলাটি অতি মহৎ এবং পরোপকারী। সংসারে তার আপনজন বলতে কেউ নেই, কিন্তু বিষয়-আসয় আছে অনেক, নিজে খেয়ে-পরে প্রচুর বেঁচে যায়। তাই খালা যতটুকু তার সামর্থ্য পরের কাজে নিজের ঐশ্বর্য বিলিয়ে দেয়, এতোটুকু কার্পণ্যতা নেই তার মধ্যে।

খালার ঐশ্বর্যের মধ্যে তার বেশ কয়টা বাড়ী ছিলো আরাকান শহরে। এ বাড়ীগুলি তার কোনটা অতিথি শালা, কোনটা দাতব্য চিকিৎসালয়, আর কোনটা ছিলো ভিখারীদের আস্তানা। এই বাড়ীগুলির একটাতেই ভাড়াটে হিসাবে বাস করতো রহমান আর নূরী—মনিও তাদের সঙ্গে ছিলো।

খালার সঙ্গে রহমান আলাপ জমিয়ে নিয়েছিলো অত্যন্ত আপন জনের মতো। খালাও ভালোবেসে ফেলেছিলো ওদের তিন জনকে একান্ত নিজের সন্তান-সন্ততির ন্যায়। মনি ছিলো বৃদ্ধার যেন নয়নের মনি। মনিকে তার বড় ভাল লাগতো, মনির নাওয়া-খাওয়া সব দায়িত্বভার নিজের ঘাড়ে

নিয়েছিলো তুলে, বিশেষ করে নূরীর অন্তর্ধানের পর রহমান যখন ক্ষিপ্তের মত এখানে সেখানে ছুটোছুটি করে ফিরেছিলো তখন এই বৃদ্ধা মনিকে বুকে আকড়ে ধরেছিলো, সান্ত্বনা দিয়েছিলো— আমি তোমার বুড়ি-মা।

তখন থেকে মনি বৃদ্ধাকে বুড়ি-মা বলে ডাকতো। বুড়িমার কথায় মনি উঠতো-বসতো— সব করতো। কাজেই বুড়ি-মা বা খালার কথায় মনি রাজি হয়ে গেলো, বললো— আচ্ছা তুমি যাও কাক্কু, আমার বাপি আর মাম্মিকে নিয়ে এসো।

এতোদিন সর্দার নূরীকে নিয়ে ফিরে না আসায় মনে মনে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলো রহমান। তবে সন্দেহ হচ্ছিলো তার সর্দার হয়তো নূরীকে নিয়ে ফিরে গেছে কান্দাই জঙ্গলে নিজের আস্তানায়। অবশ্য এই চিন্তার উপরেই বেশি জোর দিয়েছিলো বলেই রহমান আজও নিশ্চুপ ছিলো তার টাঙ্গী চালানায়।

নূরীকে হারানো বেদনা রহমান মন থেকে মুছে ফেলবার জন্যই সব সময় কাজে লিপ্ত থাকতো। নিজকে ব্যতিব্যস্ত রাখতো টাঙ্গী আর দুলকীর মধ্যে। মনিকে বুকে জাপটে ধরেও মাঝে মাঝে সান্ত্বনা খুঁজতো, কিন্তু কিসের যেন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা তাকে অহঃরহ দগ্ধীভূত করে চলতো। রহমান তখন সব ত্যাগ করে নির্জনে গিয়ে বসতো, যাকে সে কোনো দিন পাবেনা, যাকে সে জনমের মত হারিয়েছে, তাকেই স্মরণ হতো বার বার করে।

রহমান শুধু নূরীকে ভালই বাসতোনা, নূরীর মঙ্গল কামনাই ছিলো তার জীবনের মূল উদ্দেশ্য। এবং সেই কারণেই নূরীকে সে এতো সহজে ত্যাগ করতে পেরেছিলো, নূরী যাকে চায় তাকেই সে সমর্পণ করেছিলো তার হৃদয়ের রাণীকে।

সেদিন সর্দারের হাতে নূরীকে সঁপে দিয়ে হাসিমুখে ফিরে এসেছিলো রহমান তার নিজের কুটিরে। অন্তর তার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলেও সান্ত্বনা ছিলো— নূরী তার কামনার জনকে আজ একান্ত আপন করে পেয়েছে। নূরীর নারী জীবন আজ ধন্য হয়েছে, সার্থক হয়েছে তার বাসনা।

রহমান ঈর্ষা করেনা সে চায় সর্দার এবং নূরীর মঙ্গল।

কিন্তু হৃদয়ের কোথায় যেন একটা কাঁটার খোঁচা অবিরত খচ্ খচ্ করে বিঁধছিলো, কোন কিছুতেই সে বেদনার উপশম হতো না।

রহমান যখন তার ক্লান্ত দেহটা শয্যায় মেলে দিতো, হাজার চেষ্টা করেও নূরীর প্রতিচ্ছবিটিকে মন থেকে সরাতে পারতোনা। কিন্তু কেনো তার বার বার মনে পড়েছে ওর কথা, রহমান তো জানে— নূরী তাকে কোনো দিন ধরা দেয়নি— দেবেও না। তবু---তবু ওর স্মৃতি কেনো তার জীবনের

প্রতি ধাপে ধাপে আঁকা হয়ে রয়েছে। নূরী তাকে সব সময় উপেক্ষাই করে এসেছে, কোনোদিন এতোটুকু সহানুভূতি সে পায়নি ওর কাছে। তবু নূরীকে কেনো ভুলতে পারেনা----

রহমান সমস্ত চিন্তাকে মুছে ফেলে উঠে দাঁড়ালো। যাবে সে আবার সেই আরাকান জঙ্গলে, যেখানে তার কল্পনার রাণী আর রাজা বিচরণ করে ফিরছে।

মনিকে বুড়ি-মার নিকটে পৌঁছে দিয়ে দুলকীর পাশে এসে দাঁড়ালো, ঠিক সেই মুহূর্তে তাজের উপর নজর পড়তেই চমকে উঠলো তাজ এলো কখন! আশ্চর্য হয়ে তাকালো রহমান তাজের দিকে। কিন্তু একি! তাজের চেহারা সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে, কেমন যেন বিষণ্ন মনে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে আছে। দেহটা কেমন যেন ক্ষীণ-দুর্বল হয়ে গেছে ওর। তাজের দেহের দিকে তাকিয়ে রহমানের মন আশঙ্কায় দুলে উঠলো।

রহমান ক্ষিপ্র পদক্ষেপে তাজের পাশে এগিয়ে গেলো। তাজের পিঠে মাথায় গলায় হাত বুলিয়ে বললো— তাজ, সর্দার কোথায়? কেমন আছে সে?

তাজ যেন রহমানের কথা বুঝতে পেরেছে, কিছু বলবার জন্য মাথাটা নীচু করে দোলালো। বাকশক্তিহীন জীব সে, রহমান তাজের কথা বুঝতে পারলোনা। কি করে বুঝবে তাজ কি বলতে চায় বা বলছে।

রহমান তাজের অবস্থা দেখে ভীষণ চিন্তিত হলো, তার সর্দার আর নূরী কোনো বিপদে পড়েনি তো! নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে, না হলে তাজ এভাবে তার কাছে এসে দাঁড়াতো না। রহমান আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে দুলকীর পিঠে উঠে বসলো।

তাজ বুঝতে পারলো, দুলকী ছুটতে শুরু করবার পূর্বে সে ছোটা আরম্ভ করলো।

তাজ উল্কা বেগে ছুটছে।

দুলকী অনুসরণ করছে তাকে।

তাজ সোজা আরাকান জঙ্গলে প্রবেশ করলো।

দুল্‌কীর পিঠে রহমানও প্রবেশ করলো জঙ্গলে। তাজ গহন বন ভেদ করে অগ্রসর হচ্ছে। তাজ যেন দুলকীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে।

কত ঝোপ-ঝাড় আর বন পেরিয়ে তাজ এসে দাঁড়ালো জঙ্গলের মধ্যে এক স্থানে।

একে গহন বন তার পর সন্ধ্যা চলে গেছে তখন, কাজেই বনভূমি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছেনা। রহমান দুলকীর পিঠে বসে তাকালো চারিদিকে। ঝাপ্‌সা অন্ধকারে দৃষ্টি তার বেশি দূর

এগুলোনা। কিন্তু একটা উৎকট গন্ধে তার নাড়িভূড়ি বেরিয়ে আসতে চাইলো। মাংস পঁচা ভ্যাপসা গন্ধ।

তাজ আর দুলকীর পদশব্দে আশ-পাশ থেকে কতগুলি শিয়াল হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া করে ছুটে পালালো।

রহমান দুল্‌কীর পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো এবার। অজানিত একটা আশঙ্কা তার বুকের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করলো। গন্ধটা যেনো কোনো জীবের পঁচা দেহের তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাজ কেমন যেন ছটফট করছে এই স্থানে এসে। রহমান নেমে আলগোছে অগ্রসর হলো, সন্ধ্যার অন্ধকার তখন বেশ গাড় হয়ে উঠেছে। স্পষ্ট কিছুই দেখা যাচ্ছেনা।

খানিকটা অগ্রসর হতেই রহমান হঠাৎ হোচট খেয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলো। নরম কোনো বস্তুর সঙ্গে তার পা দু'খানা লেখে গিয়েছে।

রহমান এবার নাকে রুমাল চাপা না দিয়ে পারলো না। সে কি ভীষণ দুর্গন্ধ। উবু হয়ে রহমান বসে হাত দিয়ে অনুভব করতেই চমকে উঠলো, শিউরে উঠলো সে, একটা গলিত মৃতদেহ তার পায়ের কাছে পড়ে আছে।

এতোক্ষণে রহমান বুঝতে পারলো— যে উৎকট বিশ্রী গন্ধটাকে তাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে সে গন্ধ অন্য কিছুর নয়, এই মৃতদেহের। রহমানের বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়লো, শিউরে উঠলো তার পা থেকে মাথা অবধি, তবে কি তার সর্দারের লাশ এটা?

রহমান দ্রুত হস্তে পকেট থেকে ম্যাচ বাক্স বের করে আলো জ্বালালো। ম্যাচের কঠিটা তুলে ধরলো মৃতদেহের মুখে। যদিও মৃত দেহটা পচে ফুলে উঠেছে, তবুও রহমান আশ্বস্ত হলো— কারণ সর্দারের মৃতদেহ এটা নয়। সর্দারের সুন্দর চেহারা পঁচে গলে গেলেও এতো কুৎসিৎ হতে পারেনা।

রহমান ম্যাচের কাটি পর পর জ্বালিয়ে লাশটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো, যখন তার মন থেকে সব সন্দেহ দূর হলো তখন উঠে দাঁড়ালো সে। অন্ধকারে ভালো করে লক্ষ্য করতেই রহমান দেখলো আশে-পাশে আরও কয়েকটা লাশ ছড়িয়ে পড়ে আছে।

আবার রহমানের বুকের মধ্যে একটা আশঙ্কায় দোলা নাড়া দিয়ে গেলো— তবে কি এখানেই তার সর্দারের---- না, সে কথা ভাবতে পারেনা রহমান। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা করতে লাগলো তার সমস্ত অন্তর জুড়ে।

রহমান সাহসী যুবক— ভয় কাকে বলে জানেনা, তবু আজ তার মনে একটা দুর্বলতা কম্পন জাগালো। হায় আজ তাকে সর্দারের শেষ পরিণতি স্বচক্ষে দেখতে হবে। কিন্তু দেখেও উপায় নেই, দেখতেই হবে কোথায় তার সর্দার।

ম্যাচের কাটি জ্বেলে প্রত্যেকটা লাশ পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো রহমান। সে বেশ বুঝতে পারলো, সম্ভবতঃ তার সর্দারের সঙ্গে এই নরপিশাচদের তুমুল যুদ্ধ হয়ে গেছে। প্রত্যেক লাশের দেহগুলির ক্ষত যদিও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছেনা, তবু লাশগুলি দেখে ঐ রকমই মনে হচ্ছে। কোনো কোনো লাশের দেহ শিয়াল ভক্ষণ করে বিকৃত করে ফেলেছে। কোনোটাবা মুখ নেই, কারোটার বুকের মাংস, কোনো লাশের নাড়িভুড়ি ছড়িয়ে পড়ে আছে চারিদিকে।

এতো উৎকট বিশ্রী গন্ধে বেশিক্ষণ রহমান টিকতে পারলোনা। লাশগুলি বেশ দূরে এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে পড়ে আছে। রহমানের ম্যাচের কাটিও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। রাতের মত তাকে কোথাও অপেক্ষা করতেই হবে, তারপর সন্ধান করতে হবে সর্দার আর নূরীর। কিন্তু এখানে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করা তার পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠেছে। পঁচা ভ্যাপসা গন্ধে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে তার। রহমান তাজ আর দুলকীকে ডাকলো, তারপর বেশ কিছু দূরে একটা গাছের নিকটে এসে দাঁড়ালো। এখানে গন্ধ লাগছেনা, বেশ সচ্ছ বাতাস অনুভব করলো রহমান। ভালভাবে লক্ষ্য করতেই দেখলো গাছটার অদূরে বয়ে চলেছে একটা ছোট্ট নদী বা ঝরনা হবে। ঝরনার ধারেই ছোট-বড় পাথরের টিলা। রহমান এতোক্ষণে প্রাণভরে নিশ্বাস নিলো। কারণ পঁচা উৎকট গন্ধে তার নাড়িভুড়ি যেন বেরিয়ে আসছিলো।

মনে দুর্ভাবনা নিয়ে রহমান রাত কাটানোর জন্য স্থান অন্বেষণ করতে লাগলো। গহন বন, চারিদিকে হিংস্র জন্তুর গর্জন, রক্তপিপাসু জানোয়ারের লোলুপ থাবা থেকে জীবনে বেঁচে থাকতে হলে তাকে গাছে উঠতে হবে।

অগত্যা রহমান সামনে বৃক্ষে আরোহণ করাই সাব্যস্ত করে নিলো। তাজ আর দুলকী রইলো নীচে। গাছের একটা চওড়া ডালে রহমান বসে পড়লো রাতের মত।

গাছটা খুব উঁচু হলেও বেশ ঝাকড়া ধরনের কাজেই কোন অসুবিধা হলোনা রহমানের। ডালের এমন এক স্থানে এসে বসলো রহমান যেখানে তার হেলান দিয়ে বসবার মতো জায়গা ছিলো।

গাছের ডালে বসে রহমান আশ্বস্ত হলেও চিন্তশূন্য হলোনা, কারণ এখনও জানেনা সে তার সর্দার আর নূরী সুস্থ আছে কিনা। একটা উদ্ভব চিন্তাধারা তাকে অস্থির করে তুললো।

রাত যতই বেড়ে আসছে ততই গহন জঙ্গল বন্য জীবজন্তুর কোলাহলে মুখর হয়ে উঠেছে। পঁচা লাশগুলো নিয়ে শিয়াল কুকুরের দল তীব্র মারামারি আর কাড়াকাড়ি শুরু করে দিয়েছে। সে কি ভয়ঙ্কর হুলস্থূল কাণ্ড!

দুঃসাহসী রহমানের বুকটাও কেঁপে কেঁপে উঠছে। আর একটা দুর্বলতা তার মনকে বিচলিত করে তুলছিলো— সেটা সর্দারের শেষ পরিণতি চিন্তা করে। না জানি এই সব মৃতদেহের মধ্যে দস্যু বনহুরের লাশও আছে কিনা।

রহমান দু'হাতে মাথার রগ টিপে ধরে, সর্দারের অমঙ্গল চিন্তা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলোনা। শুধু সর্দারের মৃত্যু চিন্তাই নয়, তার সঙ্গে ছিলো নূরী। না জানি নূরীর পরিণতি কি হয়েছে, সর্দারকে নিহত করে নূরীকে নিয়ে শয়তানের দল পালিয়ে যায়নি তো?

কে জানে, কে জবাব দেবে তার প্রশ্নের।

রহমান চিন্তা-সাগরে হাবুডুবু খেতে লাগলো। তারপর কখন যে একটু তন্দ্রা এসেছে চোখে খেয়াল নেই তার। হঠাৎ তন্দ্রা ছুটে গেলো রহমানের, কান পেতে শুনলো একটা কেমন যেন শব্দ ভেসে আসছে। কেউ যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে বলে মনে হলো।

এখন বনটা বেশ নীরব বলে মনে হচ্ছে। পঁচা লাশগুলি নিয়ে এতোক্ষণ শিয়াল কুকুরের যে তীব্র কাড়াকাড়ি মারামারি চলছিলো এখন তারা সরে গেছে। মনে হয় ওদের ক্ষুধা নিবৃত্ত হওয়ায় অলস দেহটা নিয়ে বিশ্রামের চেষ্টা করছে। কিন্তু এ কিসের শব্দ! রহমান কান পেতে শুনতে লাগলো, এযে কোন পুরুষ মানুষ ফুঁপিয়ে কাঁদার শব্দ। তবে কি তার মনের ভ্রম? হয়তো তাই হবে— এই নির্জন গহন বনে মানুষ এলো কোথা হতে।

রহমান অন্ধকারে ভাল করে তাকালো, কিন্তু কিছুই তার দৃষ্টি গোচর হলোনা। আকাশে অসংখ্য তারা জেগে থাকা সত্ত্বেও গহন বনে এতোটুকু আলো প্রবেশে সক্ষম হচ্ছিলোনা। জমাট অন্ধকারে নিজের হাতখানাই রহমান দেখতে পাচ্ছিলো না। তবু সে মনোযোগ দিয়ে শুনতে চেষ্টা করলো।

বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে, কে যেন ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কোনো পুরুষ হৃদয়ের তাপিত দীর্ঘশ্বাস।

কিছুক্ষণ শব্দটা শোনা গেলো তারপর মনে হলো সমস্ত বনভূমি নীরব হয়ে গেছে। শব্দটা আর শোনা যাচ্ছে না।

❑

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে রহমান, খেয়াল নেই বা বুঝতেও পারেনি সে। তাজের চিঁ হিঁ চিঁ হিঁ শব্দে নিদ্রা ছুটে গেলো তার। দড়বড় উঠে সোজা হয়ে বসতে গেলো, কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিলো নিজকে, আর একটু হলেই

হয়ছিলো আর কি। একেবারে গাছের নীচে পড়ে মাথাটা থেতলে চ্যাপটা হয়ে যেতো।

কোনো রকমে নিজকে বাঁচিয়ে নিয়ে তাকালো রহমান গাছটার নীচের দিকে। দিনের আলোয় চারিদিক ঝক্‌মক্ করছে। রহমান সব দেখতে পেলো এবার। প্রথমেই রহমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো তাজ। তাজ গাছের দিকে মাথা উঁচু করে উদ্ভুত শব্দ করছে— চিঁ হিঁ চিঁ হিঁ............

রহমান বুঝতে পারলো তাজ কিছু বলতে চায় বা বলছে। আর বিলম্ব না করে নীচে নেমে এলো সে তাজের পাশে এসে দাঁড়াতেই তাজ রহমানের কাপড় কামড়ে ধরলো।

রহমান বললো—কি বলছিস তাজ?

তাজ মাথা নাড়লো এবং তাকে সামনের দিকে টানতে লাগলো।

রহমান লক্ষ্য করলো দুলকী অদূরে দাঁড়িয়ে আছে।

তাজের সঙ্গে রহমান এগিয়ে চললো, ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল পেরিয়ে তাজ চলেছে— রহমান তাকে অনুসরণ করছে।

বেশ কিছুদূর অগ্রসর হতেই রহমান দেখলো বনটা এখানে অনেক পাতলা হয়ে এসেছে। সূর্যের আলো বনভূমি উজ্জ্বল করে তুলেছে।

রহমান নিপুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চারিদিকে দেখতে লাগলো। সব দেখতে পাচ্ছে সে, কোথাও অন্ধকার নেই।

হঠাৎ রহমান বিস্ময়ে চমকে উঠলো, অদূরে একটা গাছের গুড়িতে ঠেস দিয়ে বসে আছে তার সর্দার। রহমানের দৃষ্টি প্রথম নজরেই চিনতে পারলো, যদিও মাথাটা হাটুর মধ্যে গুঁজে বসেছিলো তবু চিনতে ভুল হলো না তার।

রহমান ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে গেলো বনহুরের পাশে। অস্ফুট কণ্ঠে ডেকে উঠলো— সর্দার!

রহমানের কণ্ঠস্বর বনহুরের কানে পৌঁছলো কিনা কে জানে, যেমন বসেছিলো সে তেমনি হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে রইলো নিশ্চুপ পাথরের মূর্তির মত।

রহমান ব্যাকুল কণ্ঠে আবার ডাকলো—সর্দার—সর্দার—সর্দার.....

ধীরে ধীরে চোখ তুলে তাকালো বনহুর।

রহমানের দৃষ্টি বনহুরের মুখে পড়তেই তার বুকের মধ্যে ঝড়ের তান্ডব শুরু হলো, একি চেহারা হয়ে গেছে তার সর্দারের— মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি, চোখে উদাস চাহনি, চুলগুলো রুক্ষ তৈলবিহীন। গায়ের জামা-কাপড়ের চেহারা সম্পূর্ণ পালটে গেছে, মলিন ধূলোবালি মাখা। রহমানের দিকে তাকিয়ে বনহুর কোনো কথা বললোনা, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো।

রহমান আর নিজকে প্রকৃতিস্থ রাখতে সক্ষম হলোনা, আকুল কণ্ঠে বলে উঠলো—সর্দার, আপনার এ অবস্থা কেনো? নূরী কোথায় তাকে তো দেখছিনা?

বনহুর রহমানের মুখ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো, উদাস ব্যথা করুণ নয়নে তাকালো সম্মুখের দিকে। কিছু বলবার জন্য ঠোঁট দু'খানা যেন নড়ে উঠলো কিন্তু একটা শব্দও তার গলা দিয়ে বের হলোনা।

সর্দারের এ অবস্থা রহমানের হৃদয়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছিলো। প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলে আবার রহমান—সর্দার, কি হয়েছে বলুন? বলুন সর্দার? আর নূরীই বা কোথায়?

বনহুর আবার নিজের চোখ দুটো রহমানের মুখে তুলে ধরলো। তারপর বললো সে —রহমান, যাকে তুমি আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলে তাকে আমি হারিয়েছি।

সর্দার নূরী......

হ্যাঁ! নূরী আর জীবিত নেই।

নূরী জীবিত নেই!

না।

সর্দার নূরীর কি হয়েছিলো? কি করে তার মৃত্যু হলো?

তাকে নর-পিশাচের দল তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করেছে।

রহমান দুই হাতে বুকটা চেপে ধরে আর্তনাদ করে উঠলো

—উঃ

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব।

রহমানের গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো তপ্ত অশ্রু।

নূরীকে সর্দারের হাতে সঁপে দিয়ে আশ্বস্ত হয়েছিলো সে। যাক, নূরী যে সুখী হয়েছে তাতেই তার সান্ত্বনা। নূরীকে হারানোর ব্যথা তার হৃদয়ে আঘাত করলেও এমন নিদারুণভাবে দগ্ধীভূত হয়নি!

রহমান ডুকরে কেঁদে উঠলো—সর্দার নূরী নেই! তার মৃত্যু হয়েছে!

হাঁ, রহমান, তোমার গচ্ছিত ধন আমি হেফাযতে রাখতে পারিনি ---- বনহুর দুই হাতে মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে লাগলো। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা ফুটে উঠলো তার চোখে-মুখে।

রহমান এ দৃশ্য সহ্য করতে পারলো না, মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো সে। মর্মে মর্মে অনুভব করলো— সর্দারের এ অবস্থা কেনো, কেনো আজ সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো উদাস হয়েছে। নূরীকে কতখানি ভালোবাসতো সর্দার আজ তা সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করলো।

বেশ কিছু সময় নীরবতার মধ্যে কেটে গেলো বনহুর আর রহমানের।

রহমান ভেবে দেখলো এখন যদি সে নূরীর শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে তাহলে নূরী তো গেছেই, সর্দারকেও হারাবে। রহমান এবার ধৈর্যের বুক বেঁধে নিলো, নিজেকে শক্ত এবং সংযত করে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

এগিয়ে এলো সে বনহুরের পাশে অতি মিনতি ভরা করুণ কণ্ঠে বললো— সর্দার, সর্দার আপনার একি চেহারা হয়ে গেছে সর্দার?

বনহুর নীরব।

রহমান বলে চলে— খোদার ইংগিৎ ছাড়া কিছু হয় না। সর্দার নূরীকে আমরা হারিয়েছি— সে তো তারই ইচ্ছা। তিনি যদি নূরীকে গ্রহণ করে সুখী হয়ে থাকেন তাতে আমাদের দুঃখ করে কেনো লাভ হবে না। তাকে ফিরে পাবার আর কোনো উপায় নেই।

এতোক্ষণে কথা বলে বনহুর— রহমান, কিন্তু আমি যে নূরীর শেষ স্মৃতিগুলো কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিনা। রহমান, কিছুতেই আমি ভুলতে পারছিনা তাকে........

সর্দার, তাই বলে আপনি জ্ঞানবান হয়ে এতো অবুঝ হলে চলবে কেমন করে। ধৈর্য ছাড়া কোনো উপায় নেই। সর্দার, এখন আপনি যদি এমনভাবে ভেংগে পড়েন তাহলে যারা হাজার হাজার অনাথ-আঁতুড়- দুঃস্থ পরিবার আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রহর গুণছে, তাদের কি অবস্থা হবে, একবার ভেবে দেখুন দেখি! সর্দার, আপনার যে চেহারা দেখতে পাচ্ছি, নিশ্চয়ই আপনি এ ক'দিন কিছু মুখে দেননি।

বনহুর শুকনো ঠোঁট দু'খানা জিভ দিয়ে একবার চেটে নিলো। সত্যি সে ক্ষুধার্ত; আজ ক'দিন সম্পূর্ণ অনাহারে— একমাত্র ঝরণার পানি পান করা ছাড়া কিছু মুখে দেয়নি।

রহমান আর একদণ্ড বিলম্ব না করে ছুটে চললো। জঙ্গলে বহু সুস্বাদু ফলের গাছ ছিলো। রহমান কিছু ফল সংগ্রহ করে ফিরে এলো বনহুরের পাশে।

বনহুরকে জোর করে কয়েকটা ফল খাইয়ে দিলো। তারপর বললো রহমান— সর্দার, চলুন আরাকান শহরে, মনি তার বাপি আর মাম্মির জন্য ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে প্রতিক্ষা করছে।

বনহুর বললো— না, পারবোনা রহমান, মনির সম্মুখে আর ফিরে যেতে পারবোনা।

মনি যে আপনার জন্য কেঁদে কেটে আকুল হচ্ছে। সর্দার, মনির মুখের দিকে তাকিয়ে চলুন, চলুন সর্দার।

রহমান, কোন মুখে আমি ফিরে যাবো, মনি যখন তার মাম্মির জন্য আমাকে প্রশ্ন করবে— কি জবাব দেবো আমি তার? বলো, বলো রহমান, কি জবাব দেবো আমি তার? বনহুরের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে।

রহমান অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—সর্দার?

আমি পারবোনা আর মনির সামনে যেতে। তুমি আমাকে অনুরোধ করোনা বন্ধু।

সর্দার। সর্দার........

জানি তুমি আমার অন্তরের ব্যথা নিজের অন্তর দিয়ে অনুভব করছো। রহমান, তুমি শুধু আমার সহকারী নও— তুমি আমার বন্ধু। তোমার কাছে বলতে আমার কোন আপত্তি নেই। আমি ছোট বেলায় নূরীকে পেয়েছিলাম, যখন আমি জানতাম না জীবন কি জিনিস। প্রথম নূরীকে আমি দেখেছিলাম খেলার সাথী হিসেবে, তারপর ওর মধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছিলাম আমার পুরুষ জীবনের প্রথম আশ্বাস-ভালবাসা। আমি ওকে ভালবেসেছিলাম শুধু সাথী হিসেবে নয়—সঙ্গিনী হিসেবে। নূরীই আমার জীবনে বপন করেছিলো প্রথম ভালবাসার বীজ। আমি অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিলাম তার সেই পবিত্র ভালবাসা। কিন্তু কি বলবো তোমাকে রহমান, আমি শুধু তার কাছে গ্রহণই করে গেছি—প্রতিদানে তাকে কিছুই দেইনি। তবু সে কোনোদিন আমার উপর রাগ বা অভিমান করেনি....... আবার কণ্ঠ ধরে আসে বনহুরের, চোখ দুটো অশ্রু ছল ছল হয়। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে নিজকে প্রকৃতিস্থ করে নেয়, তারপর আবার বলে সে—রহমান, তুমি সবই জানো, তোমাকে নতুন করে আমার বলতে হবেনা। নূরীকে আমি কোনোদিন সুখী করতে পারিনি, আমি বড় পিশাচ, বড় নরাধম।

রহমান বলে উঠে এবার—সর্দার, নূরী যা চেয়েছিলো—পেয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে তার বাসনা পূর্ণ হয়েছে। নূরী জীবনে চেয়েছিলো তার বনহুরকে স্বামীরূপে পাবে, সে আশা তার বিফল হয়নি। নূরী অসুখী হয়ে মৃত্যুবরণ করেনি সর্দার।

রহমান!

হাঁ সর্দার!

কিছুক্ষণ আবার নীরবে কাটে তাদের।

রহমান বলে— সর্দার, ভেবে আর কি হবে, মনির কাছে না যেতে চান আমি আরাকানে ভিন্ন একটি বাড়ী আপনার জন্য ব্যবস্থা করবো।

তা হয় না।

তাহলে কি করবেন সর্দার?

দূরে—অনেক দূরে কোনো দেশে চলে যাবো।

আর আমাদের আস্তানা আর দলবল?

তুমি ফিরে গিয়ে সব দায়িত্বভার গ্রহণ করো রহমান।

সর্দার, আমাকে মাফ করবেন।

তাহলে তুমিও যেওনা, যেখানে নূরী নেই সেখানে গিয়ে আর কি হবে।

সর্দার, আপনি পাগল হয়ে যাবেন।

হাঁ, নূরী আমাকে পাগল করে দিয়ে গেছে। আমি ভাবতে পারছিনা নূরীর মৃত্যু হয়েছে। রহমান, সত্যিই কি নূরীকে আমি জন্মের মত হারিয়েছি?

রহমান কোনো জবাব দেয় না, দিতে পারেনা।

রহমান তখন জবাব দিতে না পারলেও বনহুরকে আর বনে ছেড়ে আসতে পারলোনা, তাকে নিয়ে এলো সঙ্গে আরাকান শহরে।

রহমান বোঝালো বনহুরকে— আপনার আরাকানে বহু কাজ আছে, আপনি যদি এ ভাবে উদভ্রান্তের মতো হয়ে পড়েন তাহলে নূরীর হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হবে না। সর্দার, যেমন করে হোক নূরীর হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতেই হবে।

বনহুর নূরীর শোকে এতো মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলো যে নূরীর হত্যাকারীকে সায়েস্তা করার কথা কোনো সময় তার মনে উদয়ই হয়নি। রহমানের কথায় বনহুরের চোখ দু'টো ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠে। একটা প্রতিহিংসার বহ্নিজ্বালা ফুটে উঠে তার মুখে।

রহমান একটা বড় বাড়ী ভাড়া নিয়ে বনহুরকে সেই বাড়ীতে এনে রাখলো। তার খাওয়া-দাওয়া বা অন্যান্য কোনো অসুবিধা যাতে না হয় সে জন্য রহমান সব কিছুর ব্যবস্থা করে দিলো।

বাড়ীখানা শহরের নির্জন প্রান্তে, মস্ত বড় বাড়ী অথচ বাড়ী খানায় কোন লোকজন নেই। উপরের তলাটাই রহমান তার সর্দারের জন্য ভাড়া নিয়েছে, আর নীচে থাকে বাড়ীর মালিক আর তার কন্যা।

বাড়ীর মালিক আরাকানবাসী ধনি ব্যবসায়ী মিঃ লারলং যৌথ, প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারী তিনি। তার কন্যার নাম মিস এলিনা যৌথ। মিস এলিনা আলটা-মডার্ণ সুন্দরী যুবতী। সব সময় ক্লাব-ফাংশান আর পার্টি নিয়ে এখানে- সেখানে ঘুড়ে বেড়ায়। পিতা বয়স্ক হলেও বৃদ্ধ নয়, যৌবন ছাড়ি-ছাড়ি করলেও সম্পূর্ণ ছেড়ে যায়নি এখনও। সারাদিন বাড়ীর মধ্যেই কাটান মিঃ লারলং যৌথ, বিশেষ দরকার ছাড়া বাইরে যান না। তেমন করে কারো সঙ্গে মেশেন না ভদ্রলোক।

বনহুর এহেন বাড়ীওয়ালার ভাড়াটে হিসাবে আশ্রয় পেলো সেই বাড়ীতে।

রহমানের পরিচয় প্রথম মি: লারলং যৌথের সঙ্গে নয়, মিস এলিনার সঙ্গেই তার প্রথম পরিচয় ঘটে। একদিন দুর্যোগপূর্ণ রাতে মিস এলিনা কোনো এক পার্টি থেকে বাড়ী ফিরবার পথে গাড়ীর অন্বেষণে অস্থির হয়ে উঠেছিলো। পথে কোনো যানবাহনই ছিলোনা সেদিন। একা একা মিস এলিনা বিপদে পড়ে গিয়েছিলো প্রায় এমন সময় রহমান তার টাক্সীখানা নিয়ে বাড়ী ফিরছিলো।

দূরে কোনো আরোহীকে পৌঁছে দিয়ে ফিরতে তার বিলম্ব হয়ে গিয়েছিলো অনেক।

হঠাৎ রহমান পথের ধারে একটি যুবতীকে দেখে গাড়ী রেখে বলেছিলো—আপনি এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে কোথায় যাবেন? যদি মনে কিছু না করেন তবে আসুন আপনাকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছেদি।

যুবতী রহমানের কথায় যেন অন্ধকারে আলোর সন্ধান পেলো। রহমান তাকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে নির্বিঘ্নে পৌঁছে দিয়েছিলো সেদিন তাকে তার বাড়ীতে।

সেদিনের পর থেকেই পরিচয় রহমানের সঙ্গে মিস এলিনার। শুধু তাই নয় মিঃ যৌথও রহমানকে স্নেহের চোখে দেখেন। রহমান প্রায়ই এ বাড়ীতে টাক্সী নিয়ে বেড়োতে আসতো, বিশেষ করে মিস এলিনার অনুরোধেই আসতো সে। রহমানের টাক্সীতে বৈকালিক ভ্রমণটা সেরে নিতো মিস এলিনা।

রহমান এই বিদেশ-বিভুঁয়ে এমন একটা সহৃদয় সঙ্গী পেয়ে আনন্দ বোধ করতো। মিস এলিনার চাল-চলন ওকে মুগ্ধ করতো, ভাল লাগতো ওর কাছে। শুধু তাই নয় মিঃ যৌথের আচার-ব্যবহারও রহমানের মনকে আকৃষ্ট করেছিলো। রহমান টাক্সী চালক হলেও তাকে মিঃ যৌথ পরম আত্মীয়ের মতোই মনে করতেন। কারণ তার একমাত্র কন্যা মিস এলিনাকে দুর্যোগপূর্ণ রাতে গাড়ীতে করে নির্বিঘ্নে বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়া কম কথা নয়।

রহমানকে সেদিন মিঃ যৌথ বহু অর্থ দিতে গিয়েছিলেন-কন্যার জীবন রক্ষার বিনিময়ে। কিন্তু রহমান একটি পয়সাও নেয় নি।

এক টাক্সীচালকের মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে মিঃ লারলং যৌথ চমৎকৃত হয়েছিলেন। তাকে আবার আসার জন্য অনুরোধ করেছিলেন তিনি।

সেই পরিচয়ে রহমান আজ এতো সুন্দর বাড়ীখানা তার সর্দারের জন্য ভাড়ায় পেয়েছে। বাড়ীখানা সত্যি সুন্দর এবং মনোরম। যদিও শহরের একপ্রান্তে এ বাড়ীটা তবু অত্যন্ত মডার্ণ ধরনের তৈরী।

রহমান সর্দারের সুখ-সুবিধার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সব ব্যবস্থাই করে দিয়েছিলো এখানে। যাতে করে সর্দারের মনে আবার শান্তি ফিরে আসে, আবার সে স্বাভাবিক হতে পারে।

কিন্তু রহমানের এতো প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো।

বনহুর কিছুতেই এ বাড়ীতে এসেও স্বস্তি পাচ্ছিলো না। একটা বিষন্নতা ভাব তাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো। সব সময় কক্ষমধ্যে নীরবে বসে বসে ভাবতো। রহমানের অনুরোধে অবশ্য নিজের বেশ-ভূষা পাল্টে পরিচ্ছন্ন হতে বাধ্য হয়েছিলো সে।

রহমান মিঃ লারলং যৌথের কাছে বনহুরের পরিচয় দিয়েছিলো—কান্দাই এর রাজকুমার বলে। কাজেই বনহুরকে রাজকুমারের মতো করেই সাজিয়ে নিয়েছিলো রহমান।

রাজকুমারের বেশে বনহুরকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছিলো। যদিও ক'দিনের অনিয়মে তার শরীর আগের চেয়ে অনেক খারাপ হয়ে গিয়েছিলো তবুও মূল্যবান বেশ-ভূষায় অপূর্ব মানিয়েছিলো তাকে।

মিঃ যৌথ এবং তার কন্যা মিস এলিনা বনহুরের সৌন্দর্যে প্রথমেই মুগ্ধ হয়ে গেলো। যদিও বনহুর তাদের সঙ্গে তেমন কোনো কথা-বার্তা বা আলাপ-আলোচনা করলোনা তবুও মিস এলিনার বড় ভাল লাগলো তাকে।

মিঃ যৌথ এবং মিস এলিনা রাজকুমার-বেশি দস্যু বনহুরকে অত্যন্ত ভালভাবে আদর-আপ্যায়ন করলো।

কিন্তু এতো করেও রহমান নিশ্চিন্ত হলো না। কিছুতেই সর্দারকে সচ্ছমনা করতে পারলো না সে। যখনই রহমান এ বাড়ীতে আসতো তখনই দেখতো, বনহুর তার হলঘরে বসে আপন মনে গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করছে। কোনো সময় এসে দেখতো, বিছানায় বালিশটা আঁকড়ে ধরে উবুঁ হয়ে পড়ে আছে, চোখের পানিতে সিক্ত হয়ে উঠেছে বালিশটা।

সর্দারের এ অবস্থা রহমানের হৃদয়ে আঘাত করতো। কেমন করে তার মনে আনন্দ আনবে, কেমন করে আবার তার সর্দার পূর্বের মত স্বাভাবিক হবে—এই চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছিলো রহমান।

নিজের কুঠিরে ফিরে গেলে মনির করুণ মুখ আর এখানে এলে সর্দারের ব্যথা-কাতর চাহনী,. রহমান যেন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। নূরীর শোকে সে নিজেই কাতর কিন্তু শোক করবার মতো অবসর কই তার। মনের সব ব্যথা পাথর-চাপা দিয়ে রহমান দু'দিক রক্ষা করার চেষ্টা করে। বাড়ী ফিরে আসতেই ছুটে আসে মনি, জাপটে ধরে রহমানকে—আমার মাম্মি এলোনা কাক্কু? আমার বাপ্পি কখন আসবে?

রহমান অতিকষ্টে নিজকে সংযত রেখে বলে—বাবা তুমি কিচ্ছু ভেবোনা। তোমার বাপি আর মাম্মি খুব ভালো জায়গায় আছে। সময় হলেই চলে আসবে তারা।

তবে আমাকে নিয়ে চলো কাক্কু, আমার মাম্মির কাছে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। কত দিন আমার মাম্মিকে দেখিনা।

হাঁ যেও, যেও মনি, কিন্তু সে যে অনেক—অনেক দূরের পথ।

আমি সেখানেই যাবো। আমার মাম্মিকে ছাড়া আমি যে আর থাকতে পারছিনা কাক্কু। কত দিন আমি মাম্মিকে দেখিনি।

রহমান অতিকষ্টে এতোক্ষণ নিজকে সংযত রেখেছিলো, কিন্তু পারেনা, মনিকে সরিয়ে দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায় সে; যাবার সময় বলে যায়—মনি তুমি থাকো, আমাকে এক্ষুনি টাঙ্গী নিয়ে বাইরে যেতে হচ্ছে।

মনি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

রহমান ততোক্ষণে বেরিয়ে গেছে বাইরে।

মনি ছুটে যায় বারেন্দায়, কিন্তু রহমান তখন টাঙ্গী নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছে।

❑

সোজা রহমান তার সর্দারের বাড়ী গিয়ে হাজির হলো। টাঙ্গী গাড়ী-বারেন্দায় রেখে সিড়ি বেয়ে উঠে গেলো উপরে।

বনহুর তখন রেলিং এ ভর দিয়ে তাকিয়ে আছে নির্জন প্রান্তরের দিকে। বাড়ীখানার পিছনে আর কোনো লোকালয় ছিলো না, শুধু বিস্তৃত প্রান্তর।

বনহুর আজকাল প্রায়ই এই রেলিং এর পাশে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতো। সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চলতো সে, কখন দিনের আলো নিভে গিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতো খেয়াল থাকতো না তার।

আজও বনহুর এই রেলিং এর পাশে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেটের পর সিগারেট পান করছিলো। সম্মুখস্থ ধুম্রকুন্ডলির দিকে তাকিয়ে ভাবছিলো কত কথা। আজ বার বার তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে একটি মুখ, সে মুখখানা আর কোনোদিন ফিরে আসবেনা, চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে কোনো অতল গহবরে।

সর্দার.....

রহমানের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে বনহুর।

কিন্তু ফিরে তাকায় না সে, যেমন দাঁড়িয়েছিলো তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে।

রহমান আবার ডাকে—সর্দার!

বনহুর ফিরে তাকিয়েই জবাব দেয়—বলো?

রহমান ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে, বলে সে—সর্দার, মনিকে যে আর রাখতে পারছিনা।

এবার বনহুর তাকালো রহমানের মুখের দিকে, হাতের অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটখানা দূরে নিক্ষেপ করে বললো—কি হয়েছে রহমান?

মনি বাপি আর মাম্মি মাম্মি করে অস্থির হয়ে পড়েছে। সব সময় আমাকে সে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। কি করি বলুন, বলুন সর্দার?

বনহুর গম্ভীরভাবে কিছু চিন্তা করলো, তারপর বললো—রহমান, মনিকে কান্দাই নিয়ে ওর মায়ের কাছে পৌঁছে দাও।

কিন্তু মনি কি এখন তার মাকে চিনতে পারবে?

রহমান, রক্তের যেখানে সম্বন্ধ সেখানে চেনা-অচেনার প্রশ্ন উঠে না। মা সন্তানকে চিনে নিতে অসুবিধা হবেনা। একদিন যাকে খুশী করার জন্য ওকে চুরি করে এনেছিলাম সে আজ নেই—কাজেই তাকে ফিরিয়ে দিয়ে এসো।

সর্দার! আর আপনি?

আমি আর ফিরে যাবো না রহমান। এ মন নিয়ে আমি মনিরার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবোনা।

সর্দার, বৌ-রাণী যদি আপনার কথা জিজ্ঞাসা করেন?

তাকে বলো—আমি ভালো আছি।

তাতেই কি বৌ-রাণী খুশী হবেন?

তুমি যা ভালো বোঝো তাকে বুঝিয়ে বলো। যাও—যাও রহমান, আমি আর ভাবতে পারছিনা কিছু।

সর্দার, আপনাকে এ অবস্থায় ফেলে আমি কান্দাই এ ফিরে যাবো কি করে? আমি এসে আপনাকে জোর করে খাইয়ে দি তবে খান, আমি এসে আপনাকে গোসলের জন্য তাগাদা করি, তবে গোসল করেন। সর্দার, আপনাকে এ অবস্থায় ফেলে আমি যেতে পারবোনা।

তাহলে মনিকে হারাবে। মনির মনের অবস্থা সচ্ছ নয়, তাকে শীঘ্র তার মায়ের কাছে পৌঁছে না দিলে হঠাৎ সে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে।

বেশ, আমি যাবো, মনিকে নিয়ে যাবো বৌ-রাণীর কাছে। কিন্তু কয়েক দিনের জন্য আমাকে এখানে থেকে যেতে হবে।

বেশি বিলম্বে খারাপ হতে পারে।

আমি মনিকে ক'দিনের জন্য সামলে নেবো।

যা ভাল মনে করো।

বনহুর নিজের কক্ষে চলে যায়।

রহমান বেরিয়ে যায় সেখান থেকে।

সিড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসতেই দূরে বাগান মধ্যে-দেখতে পায়, মিস এলিনা ফুল গাছে পানি দিচ্ছে।

এলিনার ছোটবেলা হতেই এ অভ্যাস, ফুল গাছের যত্ন করা তার বড় সখ। বাগানে যথেষ্ট মালি থাকা সত্ত্বেও এলিনা এ কাজ নিজ হাতে করতো।

আজও এলিনা প্রতিদিনের মতো বাগানে পানি দিচ্ছিলো।

রহমান সিড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলো এলিনার দিকে। রহমান তাকে দেখতে পেলেও এলিনা রহমানকে দেখতে পায়নি। সে আপন মনে পানি দিচ্ছিলো।

রহমান নিপুণ দৃষ্টি মেলে তাকালো এলিনার দিকে, সত্যি এলিনা অপূর্ব সুন্দরী। নারী-দেহে যতটুকু সৌন্দর্যের প্রয়োজন সব আছে এলিনার মধ্যে। আজ রহমান এলিনার রূপ-লাবণ্য আবিষ্কার করলো নতুন দৃষ্টি নিয়ে। রহমান ধীর পদক্ষেপে এলিনার পিছনে এসে দাঁড়ালো—দিদিমনি!

ফিরে তাকালো—কে, রহমান মিয়া!

জ্বি হাঁ।

রহমান এলিনাকে দিদিমনি বলে ডাকতো। এলিনা ওকে নাম ধরে বলতো। এলিনা রহমানকে ভালো নজরে দেখতো।

রহমানকে দেখে হেসে বললো এলিনা—খবর কি রহমান মিয়া, তোমার রাজকুমার কেমন আছেন?

রহমান মুখ গম্ভীর করে বললো—রাজকুমারের খবর ভালো নয় দিদিমনি।

কেনো? কিসের অভাব তোমার রাজকুমারের?

একটা কথা আপনাকে বলবো দিদিমনি, যদি আপনি আমাকে ভরসা দেন?

রহমানের কথা বলার ভঙ্গি দেখে হাসে এলিনা, বলে সে—এমন কি কথা রহমান মিয়া যা বলতে তোমার ভরসার দরকার?

একটু চিন্তা করে বলে আবার রহমান—আমার রাজকুমারের জীবন নিয়ে কথা দিদিমনি। আপনি যদি আমাকে ভরসা দেন তাহলে আপনাকে বলবো কথাটা।

রহমানের কথায় এলিনা চিন্তা করলো, তারপর বললো—বেশ, তোমাকে ভরসা দিচ্ছি, আমাকে বললে তোমার রাজকুমারের যদি কোনো উপকার হয় তা হলে বলো।

আপনাকে নিভৃতে বলবো।

বেশ চলো।

এলিনা এগিয়ে যায় বাগানের নির্জন স্থানে। রহমানের মুখোমুখি দাঁড়ায় সে এবার, হাসিভরা মুখে বলে—বল রহমান মিয়া, কি বলতে চাও তুমি?

রহমান যত সহজে বলবে ভেবেছিলো তত সহজে বলা তার হলোনা। যার সম্বন্ধে বলবে তার বিষয়ে ব্যাপারটা অত্যন্ত কঠিন কাজ। সর্দারের স্বভাব তার অজ্ঞাত নয়। তবু সে পুরুষ মানুষ—এখন তার যে মনের অবস্থা তাতে একমাত্র নারীই পারবে তার মনের পরিবর্তন আনতে। তাছাড়া সর্দারকে আবার তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে কেউ পারবেনা।

রহমানকে নত মস্তকে ভাবতে দেখে মিস এলিনা বললো—কি ভাবছো রহমান মিয়া?

কথা দেন দিদিমনি, আমার কথা আপনি রাখবেন?

বলো, রাখবো!

আমার রাজকুমারের মনে একটা দারুণ ক্ষত হয়েছে। সে ক্ষতের কোনো ঔষধ আমি আবিষ্কার করতে পারছিনা, যে ঔষধে তিনি আরোগ্যলাভ করতে পারেন।

এলিনা অবাক হয়ে বললো—তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা রহমান মিয়া?

আমি সব বুঝিয়ে বলছি দিদিমনি।

বেশ বলো?

দিদিমনি, যদিও আপনার সঙ্গে আমার বেশি দিনের পরিচয় নয়, তবু আপনার অন্তরের যে পরিচয় আমি পেয়েছি তা আমার মনে এনেছে একটি আশার বাণী। আমার রাজকুমার তার প্রিয়জনকে হারিয়েছে। তাকে হারিয়ে সে আজ উদ্‌ভ্রান্ত উদাসীন—এমনকি নিজের নাওয়া-খাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছেন। দিদিমনি, আপনি নারী—দয়া-মায়া-মমতায় আপনার হৃদয় পরিপূর্ণ। আমার মালিককে আপনি সুস্থ করে দিন দিদিমনি, আপনিই পারবেন তার মনকে সচ্ছ-স্বাভাবিক করতে। তার বিনিময়ে যা চান তাই আমি দেবো আপনাকে।

হঠাৎ এলিনার মুখভাব ভাবাপন্ন হয়ে পড়লো। মনে পড়লো পর পর কয়েকটা ঘটনার কথা। প্রথম যেদিন রাজকুমারের সঙ্গে তার পরিচয় হলো সেদিন সে লক্ষ্য করেছে—রাজকুমার একটি বারের জন্যও তার মুখের দিকে তাকায়নি। রাজকুমারের সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ হয়েছিলো বটে কিন্তু খুশি হয়নি তার ব্যবহারে। এরপর আরও কয়েকদিন এলিনা রাজকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ আশায় উন্মুখ হয়ে এগিয়ে গেছে সিড়ি বেয়ে উপরে, কিন্তু বিফল হয়ে ফিরে এসেছে। দারওয়ান বলেছে, কুমার বাহাদুর এখন দেখা করতে পারবেন না!

কোনোদিন বা বলেছে, তার শরীর ভাল নেই। আবার গেছে এলিনা তবু মনের আকর্ষণে, কিন্তু কোনোদিন তার সাক্ষাৎ লাভ ঘটেনি তার ভাগ্যে। আজ মিস এলিনা বুঝতে পারলো কেনো রাজকুমার তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করেছে। রাজকুমারের মনের অবস্থা তাহলে স্বাভাবিক নেই এবং সেই কারণেই সে সাক্ষাৎ আশায় গিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে। এলিনা মডার্ণ যুবতী—কেমন করে পুরুষ মানুষকে মুগ্ধ করতে হয় জানে সে। তবে এলিনা সত্যিকারের কুৎসিৎমনা বা অসৎচরিত্র মেয়ে নয়। সে ক্লাব, ফাংশন বা পার্টিতে নিয়মিত যোগ দিলেও নিজের ইজ্জৎ সম্বন্ধে সব সময় সচেতন ছিলো। বয়স এলিনার কম নয়, নিজের ভালো-মন্দ বুঝবার মতো জ্ঞানও তার হয়েছিলো। কাজেই বহু পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গে মিলামিশা করলেও এলিনা আজও কাউকে মন দিয়ে গ্রহণ করেনি বা করতে পারেনি। সেদিন রহমান মিয়া যখন রাজকুমারের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলো তখন কেনো যেন এলিনা নিজকে হারিয়ে ফেলেছিলো, বিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলো সে।

এলিনার বড় ভালো লেগেছিলো রাজকুমারকে, এতো দিনে মনের মতো একটি পুরুষ যেন সে খুঁজে পেলো। একটা অভূতপূর্ব আনন্দে হৃদয়-মন নেচে উঠেছিলো তার। কিন্তু অল্পক্ষণেই মনের ভ্রম ভেংগে গিয়েছিলো; রাজকুমার তার অপরূপ সৌন্দর্যে, আলটা-মডার্ণ সাজসজ্জায় এতোটুকু আকর্ষিত হয়নি। একবার তার দিকে ভাল করে তাকিয়েও দেখেনি সে!

সেদিনের কথা মনে হতেই এলিনার হৃদয় ক্রোধান্ধ হয়ে উঠে। আজ পর্যন্ত কোন পুরুষ তাকে উপেক্ষা করতে পারেনি, সবাই তার এতোটুকু আন্তরিকতা লাভের জন্য সর্বদা লালায়িত থাকতো। আর এই রাজকুমার তার সৌন্দর্যের অবমাননা করলো। ঐ রাতে একটি বারের জন্য ঘুমাতে পারেনি এলিনা, সর্বদা রাজকুমারের ঔদাসিন্যতা মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছিলো। আজ এলিনা বুঝতে পারলো—রাজকুমারের সে অপরাধ ইচ্ছাকৃত নয়, তার মনের দাহ তাকে চেতনালুপ্ত করে ফেলেছে। রহমানের কথায়—আজ তার মন সচ্ছ হয়ে এলো। বললো এলিনা—রহমান মিয়া, তোমার রাজকুমার সম্বন্ধে আমি ভেবে দেখবো।

হাত দুখানা জোর করে রহমান—দিদিমনি, দয়া করে এই উপকারটুকু করুন, করুন দিদিমনি। আমি আপনার কাছে চির উপকৃত থাকবো.....

বেশ, কথা দিলাম আমি চেষ্টা করে দেখবো, কিন্তু রহমান মিয়া, তোমার রাজকুমার অদ্ভুত মানুষ।

দিদিমনি, তিনি অদ্ভুত মানুষ বলেই তো আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি। আমি পারলামনা তাকে সামলে নিতে। পারলামনা স্বাভাবিক করে আনতে।

আপনি নারী, আপনাদের মধ্যে এমন একটা গুণ আছে যা মরু হৃদয়ে বারিবর্ষণ করে। তাপিত হৃদয়ে আনে অনাবিল শান্তিধারা। দিদিমনি, আমি কাল আরাকান ছেড়ে চলে যাচ্ছি, ফিরতে কিছুদিন বিলম্ব হবে।

ওঃ এই কথা! এবার বুঝতে পেরেছি—রাজকুমারকে একা ফেলে মন তোমার যেতে চাইছেনা। বলো সত্যি কি না?

হাঁ দিদিমনি, আপনি যা বলেছেন। রহমান এলিনার সঙ্গে ঠিক টাঙ্গীচালক বা একটি সাধারণ চাকরের মতো কথাবার্তা বলছিলো। সে যে একজন বিশ্ববিখ্যাত দস্যুর বিশ্বস্ত অনুচর এরকম কোনো নিদর্শনই ছিলোনা তার মধ্যে। নিজকে নিপুণভাবে টাঙ্গীচালক হিসেবে বানিয়ে নিয়েছিলো রহমান।

এলিনা বুঝতে পারে, ভৃত্য হলেও রহমান মিয়া রাজকুমারের একজন অনুগত হিতাকাঙ্খী। রাজকুমারের প্রতি তার অত্যন্ত হৃদ্যতা লক্ষ্য করে এলিনা খুশি হলো, বললো সে—তোমার কথামতো আমি......

কথামতো নয় দিদিমনি, কথা দিন, তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে দেশে যেতে পারি।

এতোবড় দায়িত্বভার আমি গ্রহণ করতে পারবো তো?

দিদিমনি, আপনিই এখন আমার ভরসা। কথাটা বলে রহমান নিজেই যেন আতঙ্কে শিউরে উঠলো। সর্দার সম্বন্ধে সে কি করে এতো বড় একটা অবান্তর ভাবধারা কল্পনায় আনতে পারলো! কিন্তু পরক্ষণেই মনকে সুস্থ করে নিলো রহমান, কারণ এখন যে অবস্থায় তার সর্দার উপনীত হয়েছে তাতে সূক্ষ্ম বিবেচনা করে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। যেমন করে হোক, যেমন ভাবে হোক সর্দারকে স্বাভাবিক করে নিতে হবে। যে ঔষধে কাজ করে তাই প্রয়োগ করতে হবে তার উপর। বললো রহমান—পারবেন আপনি। আপনারা নারী জাতি, মায়ের জাত। আপনারাই পারবেন পথহারাকে পথ দেখাতে.....একটু থেমে বললো রহমান আবার—ফিরে এসে যেন মালিককে তার স্বাভাবিক জীবনে দেখতে পাই।

রহমান কথা শেষ করে যেমন এসেছিলো তেমনি সরে যায় সতর্কতার সঙ্গে।

মিস এলিনা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে, গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করে। টাঙ্গীচালক রহমান মিয়া যা বলে গেলো তা অতি আনন্দপূর্ণ বাক্য। রাজকুমার তা হলে তার প্রিয়জন—মানে তার স্ত্রীকে হারিয়েছে। একটা খুশি দোলা দিয়ে গেলো এলিনার হৃদয়ে। তবু যা হোক রাজকুমার আজ একা। ওকে আপন করে নিতে কতক্ষণ!

মিস এলিনা বাগান থেকে এক থোকা গন্ধরাজ ফুল হাতে তুলে নিয়ে সিড়ি বেয়ে উপরে এগিয়ে চললো।

সিড়ির মুখে পৌছতেই দারওয়ান জানালো—রাজা বাহাদুর এখন তাঁর বিশ্রামকক্ষে আছেন।

এলিনা তার কথায় কান না দিয়ে এগিয়ে গেলো—রাজ বাহাদুরের সঙ্গে আমার জরুরী দরকার আছে।

আরও কয়েকজন আপত্তি জানালো, এখন রাজকুমারের সঙ্গে দেখা হবে না।

কিন্তু আজ এলিনা কারো কথা মানলো না।

গন্ধরাজের থোকাটা হাতে নিয়ে সোজা এগিয়ে গেলো এলিনা বনহুরের বিশ্রাম-কক্ষে।

বনহুর তার দারোয়ান-বয়-বাবুর্চী সবাইকে নিষেধ করে দিয়েছিলো, কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তারা যেন রাজি না হয়, কারণ তার শরীর অসুস্থ!

একমাত্র রহমানই এখানে আসতো-যেতো নিজ ইচ্ছামত, তাছাড়া একটি প্রাণী এ বাড়ীতে প্রবেশে সক্ষম হতোনা। বনহুর তাই আপন মনে শুধু নূরীর কথাই ভাবতো, আর যেন কোনো চিন্তাই ছিলোনা তার।

মিস এলিনা আজ কারো বাধা না মেনে সোজা বনহুরের বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করলো।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থমকে দাঁড়ালো এলিনা।

বনহুর তখন একা একা মেঝেতে পায়চারী করছে। পদশব্দে ফিরে তাকালো বনহুর, এলিনাকে তার কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে অবাক হয়ে তাকালো।

এলিনা হাস্য-উজ্জ্বল মুখে বললো—বড় একা একা লাগছিলো তাই একটু গল্পসল্প করতে এলাম। নিশ্চয়ই আপনি অসন্তুষ্ট হননি?

বনহুর ভ্রূকুঞ্চিত করে বললো—না। বসুন।

এলিনা গন্ধরাজের থোকাটা হাতের মুঠায় নাড়াচাড়া করতে করতে বসে পড়লো সোফায়, তারপর একটু হেসে বললো—তবু যা হোক কথা বলতে পারেন। আমি কিন্তু আপনাকে বোবা মনে করেছিলাম।

এলিনার বিদ্রুপ ভরা কথা বনহুরের কাছে অসহ্য মনে হলো। আজ তার মনের অবস্থা পূর্বের ন্যায় থাকলে এ কথাগুলো তাকে একটুও বিরক্ত করতো না। আজ এলিনার কথায় চট করে কোনো জবাব দিতে পারলো না বনহুর। যেমন নিশ্চুপ দাঁড়িয়েছিলো তেমনি রইলো।

এলিনা গন্ধরাজের থোকাটা টেবিলে রেখে বললো—আপনি বিরক্তি বোধ করলে, চলে যাই কেমন?

এবার বনহুর চোখ তুললো।

এলিনার সঙ্গে চোখাচোখি হলো বনহুরের।

এলিনা সে দৃষ্টির কাছের একমুহূর্ত আর টিকতে পারলো না, ছুটে বেরিয়ে এলো বাইরে। তারপর দ্রুত পদক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলো, নিজের ঘরে গিয়ে মুক্ত জানালার পাশে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলো। রাজকুমারের কক্ষে কেনো গিয়েছিলো, কিসের লোভে গিয়েছিলো সে ওখানে। পরপর কয়েকদিন রাজকুমারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বিফল হয়েও কি তার শিক্ষা হয়নি? এতো অপমানের পর আবার কেনো গেলো সে তার সম্মুখে? জীবনে এলিনা বহু পুরুষের সঙ্গে মিশবার সুযোগ পেয়েছে কিন্তু তাকে কেউ এমনভাবে উপেক্ষা করেনি কোনোদিন। রাজকুমার যত ঐশ্বর্যের মালিকই হন না কেনো, তাদেরই বা কম কোথায়? তার বাবা মিঃ লারলং কোটিপতি, আরাকান শহরে বাড়ী-গাড়ী-ঐশ্বর্যের অভাব নেই। আর তার নিজের নারী-জীবনেরই কোনোদিকে কম আছে! তার যৌবন-সৌন্দর্য যে কোনো পুরুষের কামনার বস্তু। কত পুরুষ তার সৌন্দর্যের ভিখারী হয়ে পিছনে পিছনে ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায়, আর কোথাকার কে রাজকুমার। কত রাজা-মহারাজা পর্যন্ত তার পাণিপ্রার্থী হয়ে তার পিতার নিকটে এসেছে। এলিনা কাউকে স্বামীত্বের অধিকার দেয়নি।

এলিনার মনে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি হলো, রহমান মিয়ার কথাতেই তো সে গিয়েছিলো সেখানে। না হলে সে কিছুতেই যেতোনা। রাজকুমার তাকে তাড়িয়ে না দিলেও তার চোখে-মুখে দেখতে পেয়েছিলো এলিনা একটা উপেক্ষার ভাব। সে সহ্য করতে পারেনি রাজকুমারের সে চাহনী।

❑

এলিনা তখন যতই রাগান্বিত বা ক্রোধান্ধ হয়ে চলে আসুক কিন্তু সে কিছুতেই রাজকুমারের উপর অভিমান করে থাকতে পারলো না। রাজকুমারের সৌন্দর্যে তার হৃদয় বাধা পড়ে গিয়েছিলো, কিছুতেই সে তাকে ভুলতে পারছিলো না। কোথাকার কে রাজকুমার, কোনোদিন যার সঙ্গে ছিলোনা তার পরিচয়, কি হবে তার কথা ভেবে....এমন নানা ভাবনা ভেবে মন থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিলো সে রাজকুমারকে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও পারেনি, ব্যর্থ হয়েছে এলিনা নিজের মনের কাছে।

কয়েকদিন অবিরত ভেবেছে, রহমানের কথাগুলোই তার বার বার মনে হয়েছে "দিদিমনি, আপনি নারী—মায়া-মমতায় আপনার হৃদয় পরিপূর্ণ। আমার রাজকুমারকে ফিরিয়ে আনতে আপনিই পারবেন। আমার রাজকুমারকে সুস্থ করতে আপনিই পারবেন.....এলিনা যতই ভাবে ততই রাজকুমার তার সমস্ত অন্তর জুড়ে দাগ কেটে বসে, কেমন যেন ভালো লাগে ওর কথা ভাবতে। এলিনা সুযোগ খোঁজে—আবার কেমন করে যাবে. সে উপরে।

এলিনা একদিন উপরে গিয়ে বনহুরের বাবুর্চির সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিলো, বাবুর্চির হাতের রান্না সে নিজের হাতে করলো, আলটা-মডার্ণ মেয়ে হয়ে আজ সে নিপুণ গৃহিনীর মতোই রান্না করলো। সুন্দর করে খাবার টেবিলে নিজের হাতে সাজিয়ে আড়ালে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলো, বাবুর্চিকে বলে দিলো—কিছুতেই যেন তার কথা রাজকুমারকে না বলে।

বাবুর্চী তার কাজে সহায়তা পেয়েছে, বলবে কি—খুশীতে সে ডগমগ হয়ে উঠেছে।

এলিনা টেবিলে সুন্দর করে খাবার সাজিয়ে আড়ালে সরে যেতেই বাবুর্চি রাজকুমারকে খাবার টেবিলে আসার জন্য জানালো।

বনহুর প্রতিদিনের মত আজও খাবার টেবিলে এসে বসলো। কিন্তু অবাক হলো সে আজ খাবার টেবিলে বসে। সুন্দর করে সাজানো খাবারগুলি, মুখে দিয়ে আরও বিস্মিত হলো। তার আরাকানী বাবুর্চি আজ হঠাৎ এমন সুন্দর পাক করতে শিখলো কি করে। আরাকানের আসার পর তার মুখ কোনোদিন এমন রান্না খায়নি। বনহুরের সুস্বাদু পাক খাওয়া অভ্যাস নয়, তবে ভাল রুচিকর জিনিস সকলেরই প্রিয়। তাই বনহুরের কাছে আজ খাবারগুলি অত্যন্ত সুস্বাদু লাগলো, অনেকদিন পর আজ পেটপুরে খেলো বনহুর।

খেতে খেতে বললো বনহুর—বাবুর্চি, আজ কে রান্না করেছে?

বাবুর্চির দৃষ্টি নিজের অজ্ঞাতে চলে গেলো ওদিকের দরজায়। সেখানে দাঁড়িয়ে এলিনা চোখের ইশারায় বারণ করে দিলো—যেন না বলে সে।

তারপর থেকে প্রায়ই বনহুর লক্ষ্য করলো—তার জন্য খাবারগুলো কে যেন সুন্দর করে রান্না করে দেয়। টেবিলে সাজিয়ে দেয় অতি নিপুণ হস্তে। এর আগে বনহুর খেতে বসে দু'এক বার খেয়ে আর মুখে করতে পারেনি, কেমন বিস্বাদ লেগেছে বাবুর্চির হাতের রান্নাগুলো। টেবিলে খাবারগুলো এমনভাবে সাজানো থাকতো যেন—কে এসব অর্দ্ধভক্ষণ করে রেখে গেছে।

বনহুর কোনোদিন তৃপ্তিসহকারে খেতে পারেনি। না খেলে নয়, তাই এসে বসতো খাবার টেবিলে।

বনহুর আরও লক্ষ্য করেছে—আজকাল তার কক্ষের বিছানা-পত্র, আলনা, বইএর সেল্‌ফ কে যেন নিপুণ হস্তে সুন্দর করে গুছিয়ে রেখে যায়! কই, আগে তো এমন করে তার বিশ্রাম-কক্ষ কেউ গুছিয়ে রাখতো না। রহমান যখন আসতো তখন যতটুকু পারতো তার নাওয়া-খাওয়া, ঘর-গোছানো সব করে যেতো, কিন্তু এখন কে তার এমন করে যত্ন নিচ্ছে। নিশ্চয়ই এ চাকর-বাকর আর বাবুর্চির কাজ নয়।

প্রথম প্রথম বনহুর এ সব লক্ষ্য করেনি তেমন করে। কারণ এ সব খেয়াল করবার মতো তার মনের অবস্থা ছিলোনা। কিন্তু পর পর যখন কয়েক দিন খেতে বসে দেখলো—কেউ যেন তার খাবারগুলি পরিপাটিরূপে রান্না করে সাজিয়ে রেখে যায় খাবার টেবিলে। বিছানার চাদরখানা আর নীচে ঝুলে থাকেনা, টেবিলে বই-পত্র বা এ্যাসট্রে ছড়িয়ে থাকেনা। তবে কে—কে সেই মায়াময়ী? বনহুরের মনে পড়ে......আর একজন তার সেবা-যত্ন এমনি করে আড়াল থেকে করতো। এমন কি সে যখন ঘুমাতো, চাদরখানা তুলে দিয়ে যেতো অদৃশ্যকারিনী তার শরীরে। মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতো, তার নিশ্বাসের শব্দ আজও লেগে রয়েছে বনহুরের কর্ণকুহরে। সে আর কেহ নয়—তার নূরী। কতদিন বনহুর নূরীকে হাতে-নাতে ধরে ফেলেছে, নূরী লজ্জায় মরিয়া হয়ে উঠেনি, হাসিতে মুখর হয়ে বলেছে—তুমি যে আমার, তাই তোমার সেবা করা আমার কর্তব্য। আজ আবার নূরীর কথাই স্মরণ হয় বনহুরের মনে।

তবে কি নূরীর আত্মা তার সেবায় ছুটে আসে সুদূর পরপার থেকে। কে তার মুখে এমন করে সুস্বাদু খাবার তুলে দিচ্ছে। কে তার শয্যা সুন্দর করে গুছিয়ে রাখছে, কে তার জামা-কাপড় পরিপাটি করে দিয়ে যাচ্ছে, সে তার নূরী না অন্য কেউ?

বনহুর সেদিন চুপটি করে দরজার পাশে এসে দাঁড়ালো। ডাইনিং রুমে খাবার টেবিলের পাশে নজর পড়তেই চমকে উঠলো বনহুর। একটি নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে টেবিলে তার খাবারগুলি সাজিয়ে রাখছে।

বনহুর কক্ষে প্রবেশ করে খাবার টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ালো। নারীমূর্তি মুখ কালো আবরণে ঢাকা ছিলো, পদশব্দে দ্রুত বেরিয়ে গেলো ডাইনিং রুম থেকে।

বনহুর থ' মেরে দাঁড়িয়ে রইলো, যেন কত হাবা মানুষ সে। কে বলবে সে দস্যু বনহুর।

কয়েকদিন পরের কথা। সেদিন বনহুর অন্যমনস্কভাবে শয়নকক্ষে প্রবেশ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। সমস্ত শরীরে আবরণ ঢাকা একটি নারী-মূর্তি তার শয্যায় বালিশগুলি সুন্দর করে গুছিয়ে রাখছে।

বনহুর অতি সন্তর্পণে এগুতে লাগলো, ঠিক তার পাশে এসে খপ্ করে ধরে ফেললো নারী-মূর্তির হাতখানা। পরক্ষণেই তার মুখের আবরণ উন্মোচন করে ফেললো, সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো বনহুর—মিস্ এলিনা, আপনি!

এলিনার মুখ বিবর্ণ হলো, কোনো কথা বলতে পারলো না সে।

বনহুর এলিনার হাতখানা মুক্ত করে দিয়ে গম্ভীর গলায় বললো—আমি ভাবতে পারিনি আপনিই সেই অদৃশ্য নারী। কিন্তু কেনো মিস্ এলিনা, কেনো আপনি এসব করতে এসেছেন?

কুমার বাহাদুর আমাকে ক্ষমা করবেন, কেনো এসব করতে এসেছি তা বলতে পারবো না।

মিস্ এলিনা, আপনাকে বলতে হবে?

আমি যদি না বলি তাহলে আপনি কি করবেন!

আপনার পিতাকে সব জানিয়ে দেবো।

মুহূর্তে মিস্ এলিনার মুখ কালো হয়ে উঠলো, কিছু বলতে গিয়ে চুপ হয়ে গেলো সে।

বনহুর দৃঢ় কণ্ঠে বললো—আপনি আধুনিক তরুণী। আপনার দাস-দাসীর সীমা নেই। আমি আশ্চর্য হচ্ছি আপনি এতো নীচ কাজে কি করে....

না, যে কাজ আমি করেছি বা করছি এ কাজ নীচ নয়। এ কাজ নারীদের জন্য। আমাকে আপনি আজও চিনতে পারেননি। যে রূপ আমার দেখছেন সে রূপ আমার আসল রূপ নয়, আমি ভালোবাসি সুন্দর একটি সংসার আর....না না, আর বলতে পারবোনা।

মিস এলিনা, আপনি ভুল করছেন, এখানে সুন্দর সংসার বা অন্য কিছুর আশা নেই......

চুপ করুন রাজকুমার। চুপ করুন। আমাকে আপনার সেবা করবার একটু অধিকার দিন। আমাকে বঞ্চিত করবেন না।

মিস এলিনা!

কুমার বাহাদুর, আপনি রাজপুত্র—আপনার সেবা করার অধিকার আমার নেই, তবু অনুগ্রহ করে আমাকে অনুমতি দিন......

বনহুর অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো এলিনার মুখের দিকে। আলটা-মডার্ণ তরুণী এলিনার মুখে আজ একি ভাবময় প্রতিচ্ছবি!

বনহুর দৃষ্টি নত করে নিলো, তারপর ধীর কণ্ঠে বললো—তাতে যদি শান্তি পান, বেশ।

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মিস্ এলিনার মুখমন্ডল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললো—কুমার বাহাদুর!

বনহুর গিয়ে দাঁড়ালো ওপাশের মুক্ত জানালার কাছে। তাকালো সীমাহীন আকাশের দিকে, একি সমস্যায় পড়লো সে আবার। বিব্রত বোধ করতে লাগলো, আরাকানে কিছুদিন থাকবে বলে এ বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলো কিন্তু তা আর হলো না। রহমান এলেই তাকে আরাকান ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু কোথায় যাবে! যেখানেই যাক্ বনহুর আর শান্তি পাবে না, নূরীকে হারানোর ব্যথা তার অন্তরকে নিস্পেষিত করে ফেলেছে। আগে সে জানতো না—তার হৃদয়ের এতোখানি অধিকার করে নিয়েছিলো নূরী।

নূরীর কথা ভাবতে গিয়ে বনহুর আবার বিমর্ষ হয়ে পড়লো, চোখ দুটো অশ্রু ছল ছল হয়ে উঠলো তার।

মিস এলিনা লক্ষ্য করলো তার মুখভাব। এগিয়ে গেলো এলিনা বনহুরের পাশে—কুমার বাহাদুর!

ফিরে না তাকিয়ে বললো বনহুর—আমাকে একটু একা থাকতে দিন মিস এলিনা।

আমি যদি না যাই আমাকে আপনি তাড়িয়ে দেবেন?

বনহুর কোনো জবাব দেয় না।

মিস্ এলিনা বললো আবার—আজ আপনাকে আমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে হবে।

বনহুর বিরক্ত ভরা চোখে তাকালো এলিনার দিকে।

এলিনা আজ অন্যদিনের মতো ছুটে পালিয়ে গেলোনা। রহমানের মুখে শুনেছে—তার রাজকুমারে মনে দারুন একটা ক্ষত আছে, সেই ক্ষতে ঔষধ দিয়ে আরোগ্য করতে হবে তাকে। এলিনা রহমানকে কথা দিয়েছে যেমন করে হোক তার মালিককে শুধ্রে নেবে, পারবে সে একাজ করতে। কাজেই এতো সহজে অভিমান বা রাগ করলে চলবেনা তার।

এলিনা বললো—আজ আপনাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে। কথাটা বলে আলনা থেকে কোট নিয়ে বনহুরের দিকে বাড়িয়ে ধরে—নিন পরুন।

বনহুর কোনো কথা বলতে পারলোনা।

মোহগ্রস্তর মতো কোটটা এলিনার হাত থেকে নিয়ে অনিচ্ছা সত্বেও গায়ে পরে নিলো।

এলিনা হেসে বললো—বাড়ীতে আর কেউ নেই কিনা, তাই আপনাকে বিরক্ত করছি। চলুন।

কোথায় যাবেন? বললো বনহুর।
এলিনা একমুখ হাসি হেসে বললো—ক্লাবে।
ক্লাবে তো আমি যাইনা মিস্ এলিনা।
আজ না হয় একটু আমার সঙ্গে গেলেন। আসুন।
বনহুর অনুসরণ করে এলিনাকে।
এলিনা আর বনহুর সিড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলো। বনহুরের মুখে তখন বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠেছে।
এলিনা আড়চোখে তাকিয়ে দেখছিলো বনহুরের দিকে, একটু দুষ্টামির হাসি তার ঠোঁটের ফাঁকে দেখা দিলো। নীচে গাড়ী তাদের জন্যই যেন অপেক্ষা করছিলো, এলিনা আর বনহুর গাড়ীর পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই ড্রাইভার নেমে গাড়ীর দরজা খুলে ধরলো।
এলিনা বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো—কুমার বাহাদুর, উঠুন।
বনহুর তার অনুগত ছাত্রের মত আদেশ পালন করলো।
এলিনা বসলো তার পাশে।
এলিনার শরীরে যে আবরণ ঢাকা ছিলো খুলে রেখে দিলো পাশে।
বনহুর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিলো ভাল করে। কারণ এতোক্ষণ এলিনার মুখমন্ডল স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলোনা।
এলিনা আজ আধুনিক ড্রেসে সজ্জিত হয়নি, তার দেহে সাধারণ সাজসজ্জা শোভা পাচ্ছিলো। বড় সুন্দর লাগছিলো আজ এলিনাকে। বনহুর ক্ষণিকের জন্য বিস্মৃত হলো তার নূরীকে।
এলিনা তার পাশে এতো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে যে ওর দেহের উষ্ণ তাপ বনহুরের ধমনিতে একটা অনুভূতি জাগিয়ে তুলছিলো। বনহুর সরে বসলো আর একটু।
হাসলো এলিনা—ওঃ আপনি রাজকুমার আর আমি সামান্য মহিলা, মাফ করবেন, ভুল হয়ে গেছে।
না না......বনহুর নিজকে সামলে নেয়।
এরপর থেকে এলিনার আব্দার রক্ষার জন্য বনহুরকে রোজ যেতে হয় তার সঙ্গে। কোনো দিন বা লেকের ধারে, কোনোদিন ফাংশানে। এলিনার জ্বালায় বনহুর যেন অস্থির হয়ে উঠে। কিন্তু যতই সে ওকে পরিহার করে চলতে চায় ততই ও যেন আরও বেশি করে উপদ্রব শুরু করে।
বনহুর হয়তো রেলিং এর পাশে দাঁড়িয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছে, ভাবছে হয়তো তার নূরীর কথা, ঠিক এমন সময় এলিনা এসে পিছন থেকে চোখ দুটো টিপে ধরে ফেলে।
বিরক্ত হলেও মুখভাব হাসি টেনে বলে—একি হচ্ছে মিস এলিনা?

এলিনা বনহুরের চোখ মুক্ত করে দিয়ে বলে—সত্যি করে বলুন দেখি কি ভাবছেন আপনি?

বনহুর গম্ভীর হয়ে যায়, দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে দূরে অসীম আকাশের দিকে।

এলিনা বলে আবার—কুমার বাহাদুর, আপনি বড্ড চাপা মানুষ আপনার কাছে আমি তো কোনো কথা গোপন করিনা, আর আপনি আমার কাছে কোনোদিন মনের কথা বললেন না। দুঃখ আমাকে আপনি বিশ্বাস করেননা আজও।

বনহুর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে—মিস এলিনা, আপনি অযথা দুঃখ করছেন। আমার মনের কথ শুনে আপনার কোনো লাভ হবেনা।

তবে লোকসানটাই বা কোথায়। কুমার বাহাদুর, আমি জানি আপনার হৃদয়ে অনেক ব্যথা। জেনেও আপনাকে বিরক্ত করি—জানিনা কেনো আপনাকে আমার বড় ভাল লাগে।

বনহুর তাকায় এলিনার মুখের দিকে।

এলিনা বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে বলে এবার—আমাকে আপনি ভালবাসতে পারেন না কি?

এলিনা।

কুমার বাহাদুর!

না, আমি কুমার বাহাদুর নই। আমি কুমার বাহাদুর নই.....

আপনি নিজকে কেনো এমনভাবে বিসর্জন দিচ্ছেন বলুন তো?আজ আমাকে বলতে হবে সব কথা?

এলিনা বনহুরের জামার অংশ মুঠায় চেপে ধরে রইলো।

বনহুর বিব্রত বোধ করতে লাগলো, হঠাৎ যদি কেউ দেখে ফেলে তখন কি ভাববে।

বললো বনহুর—বেশ ঘরে চলুন, সব বলছি।

এলিনা আর দস্যু বনহুর এসে বসলো পাশপাশি দুটো সোফায়।

এলিনা বললো—যদি বলতে অপনার খুব কষ্ট হয় তবে থাক।

কষ্ট! না হবেনা।

তবে বলুন? প্রবল আগ্রহ নিয়ে তাকায় এলিনা বনহুরের মুখের দিকে। বনহুর একটু কেশে গলাটা পরিস্কার করে নেয়, তারপর বলতে শুরু করে—ছোট বেলায় মা—বাবাকে হারিয়ে জীবনে স্নেহ—মায়া মমতা থেকে বঞ্চিত হয়েছি। কাজেই নিজকে ঠিক মানুষের মত স্বাভাবিক করে তৈরী করে নিতে পারিনি। মানুষের মত আমার চেহারাটা হলেও আসলে অন্তরটা

আমার মানুষের মত নয়। যে কোনদিন স্নেহ—মায়া—মমতা পায়নি, সে কি করে জানবে মায়া—মমতা কি জিনিষ। তাই ওসব কাউকে দিতেও জানিনা।

এ সব কি আমি শুনতে চাইছি কুমার বাহাদুর?

শুনতে যখন চাইছেন তখন সব শুনতে হবে।

তাহলে বলুন?

মানুষ হয়েছি জঙ্গলে—জীব—জন্তু পশু—পাখীদের মধ্যে। ছোট বেলায় ওরাই ছিলো, আমার খেলার সাথী।

এলিনার দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময়, অস্ফুট ধ্বনি করে উঠে—আশ্চর্য!

হাঁ, আশ্চর্য বটে। বাঘের সঙ্গে লড়াই করা, সিংহের সঙ্গে বন্ধুত্ব করাই শিখলাম। দুর্বলতা পেলোনা আমার কাছে কোনো স্থান। তাহলে ভেবে দেখুন আমার চেহারার সঙ্গে মনের কোনো মিল নেই।

অদ্ভুত মানুষ তো আপনি!

তার চেয়েও অদ্ভুত আমার মন! আরও শুনতে চান?

হাঁ আমি শুনবো আপনার জীবন-কাহিনী।

আচ্ছা বলছি সব, কিন্তু সব শোনার পর আর এক মুহূর্ত আপনি আমার কক্ষে থাকবেন না। ঘৃণার অন্তর আপনার বিষিয়ে উঠবে, আপনি আমাকে--

আপনি বলুন, বলুন রাজকুমার?

হাঁ কি বলছিলাম মিস এলিনা? হাঁ আমার চেহারার সঙ্গে আমার মনের মিল নেই এতোটুকু। আমার সেই কঠিন ইস্পাতের মত অন্তরের পাশে আর একটি কোমল প্রাণ অন্তরের সন্ধান পেলাম, যে হৃদয় স্নেহ-মায়া-মমতা প্রেম-ভালবাসায় পরিপূর্ণ। সে আমাকে তার সব কিছু উজাড় করে দিয়েছে, আর আমি তাকে দিয়েছি কঠোর শাস্তি। নির্ম্মম কষাঘাতে তাকে জর্জ্জরিত করেছি এতোটুকু করুণা সে পায়নি কোনোদিন আমার কাছে--কণ্ঠ ধরে আসে বনহুরের।

এলিনা অস্ফুট ধ্বনি করে উঠে—উঃ কি নিষ্ঠুর আপনি!

নিষ্ঠুর শুধু নই, কঠিন হৃদয়হীন পিশাচ আমি। নিতেই শুধু জানি, কাউকে দিতে জানিনা। তার কাছেও শুধু নিয়েই গেছি কিন্তু প্রতি দানে তাকে দেইন কিছু।

দেবার তো এখনও আপনার অনেক আছে! কেনো আপনি মিছামিছি হতাশ হচ্ছেন?

তাকে আর কোথায় পাবো মিস এলিনা? সে আমার ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। আর ফিরে আসবেনা কোনদিন --

কুমার বাহাদুর, আপনি তাকে বিয়ে করেছিলেন?

হাঁ।

তবু তাকে আপনি ভালবাসতে পারেননি?

কই আর পারলাম। ভালবাসা কি জিনিস আমি তো জানিনা মিস এলিনা।

আশ্চর্য কথা বললেন আপনি।

আপনাকে আমি তো সব বলেছি, আমার হৃদয়ে মায়া-মমতা-প্রেম ভালবাসা কিছু নেই, থাকলে আমি এতো পাষাণ হতে পারতাম না।

আপনি কি মানুষ!

না, আমি মানুষ নই মিস এলিনা। আমি অদ্ভুত জীব---

কুমার বাহাদুর, আপনি সুস্থ নন তাই---

না না, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ, কিন্তু এখনও আপনি আমার সব কথা শোনেননি। সব শুনলে আর কোনো সময় এখানে আসবেন না, ভয়ে শিউরে উঠবেন—আতঙ্কে পালিয়ে যাবেন----

হঠাৎ বনহুর হেসে উঠলো অদ্ভুতভাবে—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ---

মিস এলিনার চোখ দুটো ভয়ে কেমন যেন গোলকার হয়ে উঠলো, বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে রইলো বনহুরের মুখের দিকে।

হাসি থামিয়ে বলে উঠে বনহুর—আমার আসল পরিচয় জানলে আর কোনদিন আমার ছায়াও মাড়াতে চাইবেন না মিস এলিনা। আমার আসল পরিচয়---

ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করে রহমান —কুমার বাহাদুর।

রহমানকে দেখেই বনহুর চুপ করে গেলো, তাকালো তার দিকে। যা বলতে যাচ্ছিলো বলা আর হলো না।

রহমান আর মিস এলিনার মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো।

রহমান বললো—দিদিমনি, আপনাকে নীচে ডাকছেন।

এলিনা বুঝতে পারলো, রহমান মিয়া তাকে নীচে যাবার জন্য ইংগিত করলো।

এলিনা আর বিলম্ব না করে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর বললো—রহমান, মনিকে পৌঁছে দিয়েছো ওর মায়ের কাছে?

হাঁ সর্দার।

বেশ করেছো। বনহুর যেন অনেকটা আশ্বস্ত হলো।

রহমান কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বললো —সর্দার বৌ-রাণী কেমন আছেন, তাতো জানতে চাইলেন না। তা ছাড়া বেগম সাহেবা তিনিও---

আমাকে একটু নিরিবিলি থাকতে দাও রহমান। তুমি এসেছো ভালই হলো। এখানে থাকা আর চলবেনা।

কেনো, কেনো সর্দার?

প্রশ্ন করোনা। আমি তোমাকে কোনো কথা বলতে রাজি নই

তাহলে?

হাঁ, আমি আরাকান ত্যাগ করে চলে যাবো।

আচ্ছা, আমিই ব্যবস্থা করবো।

বেশ, এখন যেতে পারো।

রহমান তবু দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে।

বনহুর বিরক্ত ভরা কণ্ঠে বললো আবার—তবু দাঁড়িয়ে রইলে কেনো? কথা শেষ হয়নি বুঝি?

সর্দার, আমি বলছিলাম কি----

বলো দ্রুত বলে ফেলো?

এখন আপনার কান্দাই ফিরে যাওয়াই শ্রেয়।

তোমার চেয়ে আমি ভাল জানি, কোন্‌টা আমার জন্য শ্রেয়।

সর্দার বৌ-রাণী বার বার আপনার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন। তার শরীরের অবস্থাও খুব ভাল নয়। বেগম সাহেবা বললেন, সব সময় নাকি কাঁদাকাটা করেন উনি।

আমি জানি মেয়েরা শুধু কাঁদতেই জানে, মনিরাও কাঁদে কাঁদতে দাও।

সর্দার!

এখানে থাকা আমার আর সম্ভব নয়। আমি চলে যেতে চাই এখান থেকে।

সর্দার, আপনার আদেশ শিরোধার্য। আমি ব্যবস্থা করবো।

রহমান আর দাঁড়ায় না চলে যায় নীচে।

সিঁড়ির মুখে রহমানের জন্য অপেক্ষা করছিলো মিস্ এলিনা। রহমান গম্ভীর মুখে নেমে আসতেই এলিনা তাকে ডাকলো—রহমান মিয়া?

রহমান থমকে দাঁড়ালো—ডাকছেন দিদিমনি?

রহমান তুমি যা বলেছিলে, চেষ্টা করেছিলাম —কিন্তু পারলাম না। তোমার রাজকুমার অদ্ভুত মানুষ।

হতাশ ভরা গলায় বললো রহমান—আমি আপনাকে কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো ভেবে পাচ্ছি না দিদিমণি। কুমার বাহাদুরের জন্য আপনি যা করেছেন সব আমি শুনেছি বাবুর্চি আর চাকর বাকরের মুখে। কিন্তু দুঃখ কুমার বাহাদুর আপনাকে কোনো দিন আন্তরিকতা জানান নি।

তাতে আফসোস নেই, তোমার কুমার বাহাদুর যদি সুস্থ হয়ে উঠতো তাহলেও আমি ধন্য হতাম রহমান মিয়া। কিন্তু জানি না, তার মনে কোনো পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছি কিনা।

রহমান কোনো কথা বললো না, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো এলিনার মুখের দিকে।

❑

রহমানের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে বনহুর আবার পালিয়ে গেলো আরাকান জঙ্গলে। যেখানে সে হারিয়েছে তার শিশু বেলার সাথী-সঙ্গিনী নূরীকে।

আবার সেই গহন বন।

চারিদিকে নানারকম হিংস্র জীবজন্তুর হুঙ্কার!

বনহুর এসে দাঁড়ালো যে স্থানে নূরীর মৃত্যু ঘটেছে। তাকিয়ে রইলো নির্বাক আঁখি মেলে সেইদিকে। একটি সুন্দর জীবন-প্রদীপ শিখা নিভে গেছে চিরতরে। বনহুরের অন্তর হু হু করে কেঁদে উঠে, গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুধারা।

নূরীর স্মৃতি তার সমস্ত অন্তরে অগ্নি শিখার মত দাউ দাউ করে জ্বলছে। বুকের মধ্যে যেন একটা শূন্যতা হাহাকার করে কেঁদে ফিরছে। বনহুর নিজেই ভেবে পায় না— নূরীকে সে কখন্ এতোখানি ভালোবেসে ফেলেছিলো।

নূরীর স্মৃতি আজ বনহুরকে বিস্মৃতির পথে টেনে নিয়ে চলেছে, বনহুর ভুলে গেছে— সে একজন বিশ্ববিখ্যাত দস্যু। তার নাম স্মরণে দেশবাসীর হৃদকম্প শুরু হয়, তার দর্শনে ভুলে যায় মানুষ তার অস্তিত্ব। এ হেন দস্যু-সম্রাট আজ উদ্‌ভ্রান্তের মত উদাসীন। নূরীর স্মৃতি তাকে ভুলিয়ে দিয়েছে মনিরার কথা। যে মনিরার জন্য বনহুর কোনোদিন নূরীকে স্থান দেয়নি নিজের হৃদয়ে। মনিরার ভালোবাসার মধ্যে বনহুর হারিয়ে ফেলেছিলো নিজেকে, নূরী সরে পড়েছিলো দূরে। কিন্তু আজ নূরীকে হারিয়ে সে ভুলতে বসেছে সবকিছু।

❑

বনহুর যখন আরাকান জঙ্গলের নূরীর মৃত্যুশোকে মূহ্যমান তখন রহমান তার সর্দারের সন্ধানে এসে চিন্তিত হয়ে কক্ষমধ্যে পায়চারী করে চলেছে।

কোথায় গেলো তার সর্দার, কক্ষমধ্যে সব পড়ে আছে—এমন কি বনহুরের বাইরে যাবার জামা-কাপড় পোষাক-পরিচ্ছদ সব যেমন যেখানে তেমনি রয়েছে। নাইট ড্রেস পরেই সর্দার চলে গেছে; রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেছে সে আরাকান জঙ্গলে।

শুধু তাজ তার সঙ্গী হিসেবে গিয়েছে।

রহমান আর বিলম্ব না করে দুলকী নিয়ে ছুটলো, আরাকান জঙ্গলে তাকে পৌঁছতে হবে। যেমন করে হোক সর্দারকে ফিরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু কি করে বেঁধে রাখবে রহমান তাকে ভেবে পায় না। রহমান দুলকীর পিঠে ছুটে চলে আর ভাবে সর্দারকে কি করে রক্ষা করা যায়। যে কোনো মানুষ হলে তাকে স্বাভাবিক করে আনতে এতো বেগ পেতে হতো না কিন্তু অস্বাভাবিক মানুষ তার সর্দার।

বনহুর যে আবার আরাকানের জঙ্গলে গেছে এ সন্দেহ তার মনে দানা বেঁধেছিলো, কারণ বনহুরের রিভলভারখানাও বালিশের তলায় তেমনি পড়েছিলো। একমাত্র নূরীর কথা স্মরণ হওয়া ছাড়া, তার সর্দার কোনো সময় অস্ত্র না নিয়ে বাইরে যায় না বা যেতে পারে না। রহমান যখন দেখলো সর্দারের রিভলভারখানা বালিশের তলায় রয়েছে গেছে, তখনই সে বুঝতে পেরেছে কোথায় গেছে তার সর্দার।

রহমানের সন্দেহ সত্যে পরিণত হলো যখন সে পৌঁছলো আরাকান জঙ্গলে।

অনেক সন্ধানের পর রহমান এসে হাজির হলো সেই স্থানে যেখানে এক রাত্রিতে সে কোনো অজ্ঞাত জনের ফুঁপিয়ে কাঁদার শব্দ পেয়েছিলো গাছের ডালে বসে।

আশ্চর্য হলো রহমান, ঝরণার পাশে একটা টিলার উপরে বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুপিয়ে কাঁদছে তার সর্দার।

কিছুক্ষণ রহমান স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, অদূরে তাজ দাঁড়িয়ে আছে প্রভুর দিকে মুখ করে।

রহমান এগিয়ে গেলো, বনহুরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো—সর্দার।

সর্দার....

চোখ তুলে তাকালো বনহুর, গম্ভীর গলায় বললো—আবার কেনো এলে তুমি?

সর্দার, আপনি অবুঝ নন! আপনি জ্ঞানী-বুদ্ধিমান। সামান্য একটি নারীর জন্য আপনি উন্মাদ হয়ে যাচ্ছেন?

রহমান, নূরী সামান্যা নয়, জানোনা সে আমার কত বড় একজন।

জানি সর্দার, তাই বলে আপনি এভাবে ভেংগে পড়বেন? হাজার হাজার জনগণ আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কত নর-নারী আপনার প্রতিক্ষায় প্রহর গুণছে। সর্দার, আপনি......

রহমান।

হাঁ সর্দার, আপনি শুধু আমাদের রক্ষকই নন, আপনি আমাদের সর্দার। আপনার অভাবে সমস্ত কান্দাই নগরী খা খা করছে। বেগম সাহেবার চোখের অশ্রুর বন্যা, বৌ-রাণীর দীর্ঘশ্বাস, মনির আকুল আহ্বান কেমন করে আপনি উপেক্ষা করবেন, আমাদের জন্য আপনি ফিরে না তাকালেও তাদের জন্য আপনাকে ফিরে যেতে হবে কান্দাই এ।

রহমান, বার বার কেনো তুমি আমাকে একই কথার প্রতিধ্বনি শোনাচ্ছো। আমি সত্যিই কি উন্মাদ হয়ে গেছি? না, আমি পাগল হইনি রহমান, আমি পাগল হইনি।

সর্দার।

নূরীর স্মৃতি সব সময় আমাকে এখানে হাতছানি দিয়ে ডাকে। তাই আমি ছুটে আসি এই আরাকান জঙ্গলে। থাকতে পারিনা রহমান, আমি থাকতে পারি না কোথাও।

সর্দার চলুন, উঠুন আপনি।

চলো রহমান। চলো একটু দাঁড়াও, তুমি দেখনি সেই দৃশ্য। উঃ কি মর্মান্তিক ভয়ঙ্কর সেই মুহূর্তটি -------- ঐ পাথরখন্ডটার উপর বসেছিলাম আমি। ও তখন রাজহংসীর মত সাঁতার কাটছিলো ঝরণার পানিতে। সচ্ছ সাবলীল পানির মধ্যে জলপরীর মত সুন্দর অপূর্ব লাগছিলো তখন ওকে। আমি নির্বাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম, ভুলে গিয়েছিলাম আমার অস্তিত্ব। তারপর জানো রহমান.......

বলুন সর্দার?

হঠাৎ নূরী ঝরনা থেকে ঝড়ের বেগে উঠে এসে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমাকে আড়াল করে দাঁড়ালো। আমি কিছু বুঝবার পূর্বেই নূরী তীব্র আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো ভূতলে। উঃ কি রক্ত। রহমান, আমি নূরীর দিকে একবার মাত্র তাকিয়ে দেখেছি, তারপর....

সর্দার আপনি বেশি নার্ভাস হয়ে পড়ছেন, যে গেছে তার কথা আর ভেবে কোনো লাভ হবে না। আপনি চলুন সর্দার।

রহমান বনহুরের হাত ধরে তাজের পাশে নিয়ে এলো। তাজের পিঠে বনহুরকে চাপিয়ে দিয়ে নিজে চেপে বসলো দুলকীর পিঠে।

❑

বনহুর আর রহমান যখন ফিরে এলো আরাকান শহরে তার ভাড়াটিয়া বাড়ীতে তখন মিঃ লারলং তার বন্ধুকে নিয়ে বেলকুনিতে দাঁড়িয়ে কোনো গোপন আলোচনা করছিলেন। মিঃ লারলং এর প্রধান বন্ধু ভোলানাথ—যে নূরীকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলো রহমানের কুঠির থেকে ভিখারীর বেশে।

বনহুর আর রহমান যখন অশ্বপৃষ্ঠে গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করছিলো ঠিক তখন ভোলানাথের দৃষ্টি চলে যায় তাদের উপর। চমকে উঠে সে, দু'চোখে যেন অগ্নি বর্ষণ করে সে।

মিঃ লারলং বলেন— ওরা আমার উপরের ভাড়াটে; তুমি ওদের চেনো ভোলা?

আমার শত্রু ওরা।

বলো কি?

লারলং, এর কথাই তোমাকে বলেছিলাম এবং কয়েকদিন আগেও আরাকান জঙ্গলের মধ্যে এর সন্ধানে আমি উল্কার মত ঘুরে ফিরেছি, তবুও পাইনি। আজ দেখছি সাপের গর্তে ব্যাঙ আস্তানা গেড়েছে।

হেসে বললো লারলং —তোমার মুখের গ্রাস এরাই কেড়ে নিয়েছিলো তা হলে?

হাঁ, তুমি জানোনা, লারলং, সেই অপূর্ব সুন্দরী যুবতীটিকে হারিয়ে আমি কতখানি ভেংগে পড়েছি। সত্য বলতে কি এমন চেহারার মেয়ে আমার চোখে আজ অবধি একটিও পড়েনি।

লারলং বললো আবার—বয়স তো তোমার কম হলো না, তবু এখনও নারী লালসা.......

চুপ, ওরা এদিকে আসছে।

ভয় নেই, ওরা সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাবে। প্রথম ব্যক্তি কে জানো ভোলা?

পরিচয় জানিনা তবে এটুকু জানি, লোকটা মস্ত বড় বীর যোদ্ধা বললেও ভুল হয়না। আর ওর সঙ্গীটি একজন টাঙ্গীচালক। হাঁ, যুবতীটিকে টাঙ্গীচালকের বাড়ী থেকেই হরণ করা হয়েছিলো।

লারলং বললেন— প্রথম যুবক কান্দাই এর রাজকুমার আর ওর সঙ্গীটিকে ঠিক চিনতে পেরেছো, সে রাজকুমারের টাঙ্গী চালক। কিন্তু যে যুবতীটিকে তোমরা হরণ করেছিলে সে ওদের কে হয় তাতো শুনিনি!

আচ্ছা, আজ আমি ওদের সব জেনে নেবো। সাপের গর্তে যখন প্রবেশ করেছে তখন ভোলানাথের ছোবল থেকে মুক্তি পাবে না।

বনহুর আর রহমান তখন ঘোড়াশালে ঘোড়া রেখে সিড়ি বেয়ে উপরে চলে গেলো।

ভোলানাথ দাঁতে দাঁত পিষলো।

মিঃ লারলং শুধু ব্যবসায়ী নন, তার ব্যবসার মূল উদ্দেশ্য শহরের সমস্ত শয়তান লোকদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করা। প্রচুর অর্থের অধিকারী লারলং যৌথ। আরাকান শহরের দুষ্ট লোকগণ কুকর্মের জন্য অর্থের প্রয়োজন মনে করলে লারলং এর অর্থে সুদে আসলে তার প্রাপ্য পরিশোধ করে দেয়। দূষিত আবর্জনার মত পাপকার্যে সঞ্চিত অর্থ স্তূপাকার হতে থাকে মিঃ লারলং এর লৌহসিন্দুকে। অর্থ পিপাসু লারলং তাই শহরের শেষ প্রান্তে গড়ে নিয়েছিলো তার ইমারৎ।

শহরের যত দুষ্ট লোকজনের আনাগোনা ছিলো মিঃ লারলং যৌথের বাড়ীতে; কিন্তু প্রকাশ্যে নয়— অতি গোপনে। শহরের মানুষ জানতো—মিঃ যৌথ সদাশয় এবং মহৎ ব্যক্তি। তাঁর উপরের খোলস ছিলো অতি ভদ্র ও সাধু বেশি, কিন্তু ভিতরটা ছিলো অত্যন্ত মারাত্মক বিষাক্ত সর্পের চেয়েও সাংঘাতিক।

রাজকুমারকে তার বাড়ীতে ভাড়াটে হিসাবে আশ্রয় দেবার পর মিঃ লারলং এর মনে নানা রকম কুৎসিৎ অভিসন্ধি উঁকি দিয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু এলিনার জন্য সহসা কিছু করে উঠতে পারছিলো না। লারলং যতই দুষ্ট প্রকৃতির লোক হোক না কেনো এলিনা ছিলো ভাল মেয়ে, অন্তরটা ছিলো তার স্বচ্ছ। পিতার মত কলুষিত ছিলোনা তার ভিতরটা।

রহমান যেদিন এলিনাকে দুর্যোগময় রাত্রিতে তার টাঙ্গীতে করে এ বাড়ীতে পৌছে দিয়েছিলো সেদিন সে বুঝতে পারেনি— মিঃ লারলং কত বড় সাংঘাতিক মানুষ। এবং সেদিন মিঃ লারলংকে চিনতে পারেনি বলেই রহমান তার রাজকুমারের জন্য বেছে নিয়েছিলো শহরের এক প্রান্তে নির্জন এ বাড়ীটা। ভেবেছিলো এই নিরিবিলি পরিচ্ছন্ন জায়গাটা তার সর্দারের বিদগ্ধ অন্তরে আনবে একটা শান্তিধারা।

কিন্তু রহমান সেদিন বুঝতে পারেনি—কত বড় সাংঘাতিক ফাঁদে তারা পা দিলো।

আজ ভোলানাথ স্বচক্ষে দর্শন করলো রাজকুমার ও তার সঙ্গীটিকে। ভোলানাথের অন্তরে বিষের আগুন জ্বলে উঠলো দাউ দাউ করে। এই রাজকুমার শুধু তার মুখের গ্রাসই কেড়ে নেয়নি। তার বহু অনুচরের জীবন বিনষ্ট করে দিয়েছে।

দাঁতে দাঁত পিষে বললো ভোলানাথ— রাজকুমার! দাঁড়াও বন্ধু আমি তোমার রাজকুমার—জীবন প্রদীপ কেমন করে নিভিয়ে দেই, একবার দেখো।

মিঃ লারলং চারিদিকে তাকিয়ে বললো— আস্তে, বন্ধু আস্তে। এলিনা যদিতে জানতে পারে তাহলে তোমার সব অভিসন্ধি মাঠে মারা যাবে।

পিতা আর ভোলানাথ যখন রাজকুমারকে নিয়ে গোপন আলোচনা চালাচ্ছিলো তখন এলিনা দেয়ালের ওপাশ থেকে সব শুনছিলো কান পেতে।

এলিনাকে রাজকুমার উপেক্ষা করুক না কেনো, সে তবু তার অমঙ্গল চিন্তা করতে পারেনা। এলিনার হৃদয় জুড়ে রাজকুমার বিরাজ করছে। ওকে ওর ভাল লাগে। আপনভোলা মানুষটি!

পিতার কথায় ভোলানাথ বললো— যৌথ, তোমার কন্যাটি বড় বেয়াড়া।

শুধু বেয়াড়াই নয় বন্ধু আমার প্রত্যেকটা কাজে সে আজকাল বাধার সৃষ্টি করে চলেছে কিন্তু কি করবো, মা-মরা মেয়েটাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারিনি।

ভোলানাথ হাসলো।

শয়তান ভোলানাথের হাসির শব্দ এলিনার শরীরে যেন আগুন ধরিয়ে দিলো।

ভোলানাথ হাসি থামিয়ে বললো—যৌথ, তুমি জানোনা রাজকুমারের দেহে অসীম বল। আমার পঞ্চসবুজ অনুচরদের তিন জনকে সে একা হত্যা করছে। শুধু তাই নয়, আমার দলের আরও বিশজন নিহত হয়েছে ঐ রাজকুমারের রিভলভারের গুলীতে।

বলো কি?

হাঁ, অব্যর্থ লক্ষ্য তোমার ঐ ভাড়াটে যুবকের। যৌথ, আমি ওর বুকের রক্ত শুষে নেবো। আমি ওর বুকের রক্ত শুষে নেবো.........

এলিনা আড়ালে দাঁড়িয়ে শিউরে উঠলো। নীচের ঠোঁটখানা উপরের দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলো, সেও দেখে নেবে কেমন করে রাজকুমারের বুকের রক্ত ভোলানাথ শুষে নেয়।

আবার শোনা গেলো ভোলানাথের কণ্ঠ— বন্ধু তোমাকে সহায়তা করতে হবে। আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে তোমাকে সাহায্য করবো। কথাগুলো মিঃ লারলং যৌথ বললেন।

ভোলানাথ গলার স্বর খাটো করে নিয়ে কি যেন সব ফিস্‌ফিস্‌ করে বললো।

এলিনা অনেক চেষ্টা করেও শুনতে পেলোনা ভোলানাথের শেষ উক্তি গুলি।

পিতার সঙ্গে ভোলানাথের পরামর্শ শুনা পর্যন্ত এলিনার মনে একটা গভীর চিন্তা আলোড়ন সৃষ্টি করলো। এতোকাল সে তাঁর পিতাকে নানা রকম কুকর্মে লিপ্ত হতে দেখেও কোনো প্রতিবাদ করেনি। আজ তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। একজন নিরপরাধ ব্যক্তির জীবন বিনষ্ট করবার জন্য এতো আগ্রহশীল কেনো তার বাবা! কি অন্যায় সে করেছে তার? ভোলানাথের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে, তাতে তার পিতার কি লাভ-লোকসান?

কিন্তু সে বেঁচে থাকতে রাজকুমারের কোনো অমঙ্গল করতে পারবেনা।

এলিনা লক্ষ্য করলো, সিড়ি বেয়ে রহমান মিয়া নেমে আসছে। হয়তো রাজকুমারকে তার কক্ষে পৌছে দিয়ে ফিরে যাচ্ছে সে।

এলিনা চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিলো, তারপর দ্রুত সিড়ির মুখে এসে দাঁড়ালো।

রহমান নেমে আসতেই এলিনা বললো— রহমান মিয়া, আজ আমাকে তোমার টাঙ্গী করে বেড়াতে নিয়ে যাবে?

রহমান ব্যস্তভাবে নেমে আসছিলো, বললো এবার— আজ নয় দিদিমনি, আর একদিন নিয়ে যাবো।

না, তা হবেনা, আজকেই আমাকে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে।

একটু চিন্তা করে বললো রহমান—বেশ সন্ধ্যার আগে যাবেন। আমার একটু জরুরী কাজ আছে কিনা।

বেশ, মনে থাকে যেন।

নিশ্চয়ই মনে থাকবে দিদিমনি।

রহমান চলে যায়।

এলিনা তাড়াতাড়ি কক্ষমধ্যে চলে যায়।

সন্ধ্যায় এলিনার কথামত এলো রহমান, টাঙ্গী রেখে নেমে দাঁড়ালো।

এলিনা রহমানের প্রতিক্ষায় ছিলো, এগিয়ে গেলো টাঙ্গীর দিকে।

অমনি পিছন থেকে মিঃ লারলং ডাকলেন— এলিনা, কোথায় যাচ্ছো মা?

একটু বেড়াতে।

বেশ তো, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে, আজ সারাটা দিন বাইরে বের হইনি কিনা।

এলিনার মুখ বিষণ্ন হলো, কারণ দ্বিপ্রহরে তার পিতার আর ভোলানাথের মুখে শোনা কথাগুলো শোনার পর থেকে স্বস্তি ছিলোনা তার

মনে। এখানে থাকলে রাজকুমারের জীবন যে কোনো মুহূর্তে বিনষ্ট হতে পারে। সেই জন্য এলিনা রহমানকে গোপনে বলবে তার রাজকুমারকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যেতে। কিন্তু তার বাবা সঙ্গে গেলে কিছু বলা হবে না। বরং রাজকুমার বাড়ীতে একা থাকবে সেই সময় ভোলানাথ কোনো চক্রান্ত করতে পারে।

এলিনা বললো—তা তুমি গেলে ভালই হতো বাবা। কিন্তু আমার এক বান্ধবী আজ বেড়াতে আসার কথা আছে, একটুও মনে ছিলোনা। তারপর রহমানের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো— তোমাকে কষ্ট দিলাম মনে কিছু করোনা, কেমন?

না না দিদিমনি, আমরা গরীব মানুষ, আমাদের আবার কষ্ট কি?

এলিনা কথার মধ্যে ফিস ফিস করে বললো তোমার সঙ্গে কথা আছে, কাল এসো।

রহমান আশ্চর্য হলোনা, সে প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলো— দিদি কোনো গোপন কথা বলবার জন্য তাকে নিভৃতে নিয়ে যেতে চায়। রহমান বললো— আসবো।

বনহুর নিজের শয্যায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসে চিন্তা করছিলো। আঙ্গুলের ফাঁকে অগ্নিদগ্ধ সিগারেট। দৃষ্টি তার সম্মুখের দেয়ালে সীমাবদ্ধ।

গভীর রাত।

সমস্ত আরাকান শহর নিস্তব্ধ।

শহরের শেষ প্রান্তে মিঃ লারলং এর বাড়ীও ঘুমিয়ে পড়েছে অন্ধকারের কোলে।

গেটে রাইফেলধারী পাহারাদার ঝিমাচ্ছে।

বনহুর শুধু জেগে আছে তার কক্ষে।

টেবিলে লণ্ঠন জ্বলছে।

হঠাৎ দেয়ালে একটা ছায়া পড়লো।

বনহুর চমকে উঠলোনা, কিন্তু তার মনের চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। সজাগ দৃষ্টি মেলো তাকোলো— ছায়া ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। বনহুরের হাতখানা বালিশের তলায় চলে গেলো, দ্রুত হস্তে রিভলভার খানা টেনে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো—কে?

একি! মিস এলিনা আপনি— এতো রাতে!

এলিনা গম্ভীর গলায় বললো— তবু যা হোক আপনি সজাগ ছিলেন।

মিস এলিনা আপনি কি মনে করেছিলেন— আমি একেবারে অচেতন?

না, ঠিক তা নয়। কুমার বাহাদুর, এতো রাতে এখানে কেনো এসেছি জানেন?

জানার বাসনা আমার নেই মিস এলিনা। আপনি এখানে এসে ভাল করেন নি। কারণ আপনার বাবা যদি জানতে পারেন তাহলে কি হবে জানেন নিশ্চয়ই?

কুমার বাহাদুর, আমি একটা কথা বলতে এসেছি.....

ঠিক সেই সময় শোনা গেলো মিঃ লারলং এর কণ্ঠস্বর — এলিনা! এলিনা! এলিনা.....

বনহুর বললো— মিস এলিনা, আপনার কথা শোনার সময় হলোনা। এখন যেতে পারেন আপনি।

এলিনা সিড়ি বেয়ে নীচে নেমে যেতেই মিঃ লারলং কঠিন কণ্ঠে বললেন—এলিনা, আমি ভাবতে পারিনি তুমি এতো অধঃপতনে গেলে কি করে! ছিঃ ছিঃ তোমার চরিত্র সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত বিশ্বাসী ছিলাম কিন্তু তুমি আমার চোখে ধূলো দিয়ে...........

বাবা, আমি চরিত্রহীনা মেয়ে নই।

আগে তাই জানতাম, কিন্তু রাজকুমারের রূপে তুমি পাগল হয়ে গেছো।

বাবা!

তুমি মুখে না বললেও আমি সব বুঝতে পেরেছি। যাও, নিজের ঘরে যাও। ঘুমাওগে।

এলিনা আর কোন কথা বলতে পারলোনা, চলে গেলো।

সেদিন এলিনা তার কক্ষ থেকে বেরিয়ে বারেন্দা দিয়ে সোজা বাগানে চলে যাচ্ছিলো। হঠাৎ শুনতে পেলো পিতার কক্ষে ভোলা নাথের কণ্ঠস্বর।

থমকে দাঁড়ালো এলিনা। কান পেতে শুনতে লাগলো সে।

ভোলানাথ বলছে তার পিতাকে— অতি সাবধানে কাজ শেষ করতে হবে যৌথ। তোমার মেয়ে যেন এর বিন্দুমাত্র জানতে না পারে।

কথাগুলো এলিনার শিরায় শিরায় আলোড়ন জাগালো। কি এমন কাজ করবে যা সে জানলে ভয়ানক ক্ষতি হবে তাদের? এলিনা আরও সরে দরজার পর্দা ঘেষে দাঁড়ালো।

মিঃ লারলং এর গলার আওয়াজ— এলিনা জানবেনা, ওকে আমি জানতে দেবোনা ভোলা, তুমি নিঃসন্দেহ থাকো।

তাহলে কবে ফাংশন করবে মনস্থ করছো?—ভোলার কণ্ঠ।

লারলং বললেন—আগামী পরশু রাত্রি আমার মেয়ে এলিনার জন্মদিন। ঐ দিনটাই আমি বেছে নিয়েছি। হাঁ রাজকুমারকে ঐদিন আমি আমন্ত্রণ জানাবো। আমরা এক সঙ্গেই খাবো বুঝলে, কিন্তু রাজকুমারের খাদ্যের

সঙ্গে থাকবে বিষ মিশানো। অতি ভয়ঙ্কর মারাত্মক বিষ, বুঝলে? কিন্তু মৃত্যুর পর তার লাশটা.......

হাঃ হাঃ হাঃ তুমি না একজন এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ লোক? তোমার মুখে এ কথা শোভা পায়না লারলং। রাজকুমারের মৃত্যুর পর তার মৃতদেহ সৎকারের ভার আমার উপর ছেড়ে দিতে পারো।

নিশ্চিন্ত করলে বন্ধু। কিন্তু এজন্য আমাকে কি বখসীশ্ দেবে তাতো বললেনা?

তুমি বন্ধু লোক, জানোতো রাজকুমারের মৃত্যুতে আমার লাভ লোকসান কিছুই নেই। শুধু প্রতিশোধ আমি নিতে চাই। রাজ কুমার আমার মুখের গ্রাসই শুধু বিনষ্ট করেনি। আমার বিশ্বস্ত অনুচরদের নিহত করে সে আমাকে পঙ্গু করে দিয়েছে। আমি চাই প্রতিশোধ হাঃ হাঃ হা ঃ

তুমী বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়ছো ভোলানাথ, কৌশলে কার্যসিদ্ধি করতে হবে।

যদি আমি মনের ঝাল মিটাতে পারি তাহলে তুমি আমার কাছে মোটা অঙ্ক পাবে। অবশ্য এতে আমার ক্ষতি ছাড়া লাভ হবেনা।

প্রতিহিংসার জ্বালা মিটাতে হলে কিছু ক্ষয়ক্ষতি হবে বৈকি।

আচ্ছা, তোমার কথাই ঠিক্ রইলো যৌথ।

কক্ষমধ্যে ভোলানাথ বোধ হয় উঠে দাঁড়ালো। আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে এলিনা সরে গেলো সেখান থেকে।

এলিনার মনে ঝড় শুরু হলো, আজ রাত ও কালকের দিন পর রাত্রিতে তার জন্মদিনের উৎসব উদযাপিত করবে— এ ক'দিন এলিনা জন্মদিনের উৎসব আনন্দ কিভাবে উদযাপিত করবে—এ নিয়ে নানাভাবে জল্পনা-কল্পনা করেছে মনের মধ্যে। ঐদিন আসবে তার কত বন্ধু-বান্ধব আর বান্ধবী। তাদের নিয়ে নানা রকম হাসি-গান বাজনা চলবে। আর চলবে খানাপিনা। কত রকম গল্পের ফুলঝুরি।

আজ এলিনার মন থেকে তার জন্মদিনের উৎসবের আনন্দ খেয়াল নিমিষে মুছে গেলো। জন্মদিন তার কাছে যেন বিষাক্তময় ক্ষণ বলে মনে হতে লাগলো। একটি নিরপরাধ জীবনের হবে পরিসমাপ্তি ঐ দিন।

এলিনা নানাভাবে চিন্তা করে চলে, কি করে রাজকুমারকে বাঁচানো যায়।

রাজকুমার যদিও তার প্রতি কোনো সময় সদয় ব্যবহার করেননি, তবু এলিনা পারেনা তার মৃত্যু চিন্তা করতে। নিজের অজ্ঞাতে সে ভালোবেসে ফেলেছিলো রাজকুমারকে।

সময় কারো মুখাপেক্ষী নয়।

এলিনার জন্ম দিন এসে পড়ে।

মিঃ লারলং এর বাড়ী আলোয় আলোকময়। নানারকম ফুল আর পাতা দিয়ে গোটা বাড়ীটা সুন্দর করে সাজানো রয়েছে।

মিঃ লারলং নিজে গিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছে উপর তলায় রাজকুমারকে। বনহুর প্রথমে অমত করেছিলো, কিন্তু মিঃ লারলং এর অনুরোধে কথা দিয়েছিলো যাবো বলে।

এলিনা কথাটা শুনে শিউরে উঠেছিলো। রাজকুমার যদি না আসতো তবু খুশি হতো সে।

এলিনা সুযোগ খুঁজতে লাগলো, এক ফাঁকে হাজির হলো সে উপর তলায়।

কিন্তু রাজকুমারকে কোনো কথার বলার মত সুবিধা করে উঠতে পারলোনা। অন্যান্য লোকজন থাকায় কিছু বলতে পারলোনা সে তাকে।

বনহুর তখন ভেবেছিলো, এলিনা তাকে নিজে এসেছে দাওয়াৎ করবে। কাজেই হেসে বলেছিলো সে— মিস এলিনা, আপনার জন্মদিনে আমন্ত্রিত হয়ে নিজকে ধন্য মনে করছি।

এলিনা কোনো জবাব দিতে পারেনি সেই মুহূর্তে। বিবর্ণ মলিন হয়েছিলো তার মুখমণ্ডল।

বনহুর বলেছিলো আবার— মিস এলিনা, আপনার জন্মদিনে কি উপহার দেবো ভেবে পাচ্ছিনা।

এলিনা হাসবার চেষ্টা করে বলেছিলো তখন— আপনার আশীর্বাদ আমার পরম সম্পদ কুমার বাহাদুর।

এরপর এলিনা ফিরে গিয়েছিলো।

সন্ধ্যার পর থেকে নানা রকম লোকজনে ভরে উঠলো মিঃ লারলং এর বাড়ীখানা।

ঝকঝকে গাড়ী আর গাড়ী বাড়ীর সম্মুখ-পথে ভীড় জমে গেলো এলিনা নিজে সবাইকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে। আনন্দ আর খুশী ভরা দিনেও এলিনার মুখে হাসি নেই। কেমন যেন একটা বিমর্ষ ভাব এলিনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

বন্ধু-বান্ধব আর বান্ধবী এলিনার কম নেই, সবাই এসেছে তাকে জন্মদিনের অভিনন্দন জানাতে।

এলিনাকে সকলের সঙ্গে হাতে হাত মিলাচ্ছে।

অনেকেই এলিনার বিমর্ষ মুখোভাব লক্ষ্য করে বলছে— হ্যালো মিস এলিনা, তোমাকে আজ বড় ভাবাপন্ন লাগছে, ব্যাপার কি বলতো তো?

এলিনা হেসে বলেছে— শরীরটা আজ বড় কেমন লাগছে।

সেকি এলিনা, শরীর খারাপ? হয়তো প্রশ্ন করেছে তার ক্লাবের কোনো বন্ধু কিংবা বান্ধবী।

এলিনাও প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলেছে।

এমন সময় এলো বনহুর, রাজকুমারের ড্রেস তার শরীরে। অদ্ভুত অপূর্ব সুন্দর লাগছে আজ বনহুরকে।

এলিনা অভিনন্দন জানালো রাজকুমারকে।

কিন্তু এলিনার চোখ দু'টো ছল্ ছল্ করে উঠলো যেন। দৃষ্টি তুলে ভালো করে তাকাতে পারলো না সে রাজকুমারের মুখে।

বান্ধবীরা টিপ্পনী কাটলো এবং বললো—বুঝতে পেরেছি রাজকুমার শুধু তোমার অতিথি নয়, তোমার হৃদয় —সিংহাসনের রাজা।

এলিনা সে কথায় কোনো জবাব দিতে পারেনি।

অন্যান্য আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে বনহুর এসে বসলো।

অদূরে ভোলানাথ আজ মুখে একমুখ দাড়ি লাগিয়ে একপাশে চুপটি করে বসেছে।

আর মিঃ লারলং অতিথিদের সমাদর করে বসাচ্ছিলেন।

টেবিলে এখনও খাবার দেওয়া হয়নি।

এলিনার মনের মধ্যে ঝড় বইছে। আর অল্পক্ষণ পরেই রাজকুমারের ঐ সুন্দর মুখখানা বিষাক্ত খাবার ভক্ষণে কালো হয়ে উঠবে। মৃত্যুর করাল ছায়া নেমে আসবে তার সমস্ত দেহে। উঃ! কি সাংঘাতিক ঘটনা ঘটবে আর একটু পরে।

এলিনার মধ্যে একটা চঞ্চলতা দেখা দেয়।

বন্ধু-বান্ধবীরা ধরেছে তাকে একটা গান গেয়ে শোনাতে হবে। কিন্তু এলিনার গলা দিয়ে কোনো সুর আজ বের হচ্ছে না। অনেক চেষ্টা করেও একটা গান গাইতে পারলো না এলিনা।

বনহুর এলিনার জন্য সবচেয়ে মূল্যবান একটি লকেট এনেছিলেন লকেটটি সে হাতে দিলো এলিনার।

এলিনা লকেটখানা হাতে নিয়ে খুশি হলো অত্যন্ত। কিন্তু পরক্ষণেই লকেট খানা ছুড়ে ফেলে দিলো মেঝেতে— এ লকেটখানা নকল। আমাকে নকল লকেট দিয়ে আপনি অপমান করলেন।

শুধু বনহুরই নয়—কক্ষমধ্যে সকলে এলিনার এই অসৎ ব্যবহারে আশ্চর্য হয়ে গেলো।

মিঃ লারলং লকেটখানা হাতে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে বললেন —এ লকেট আসল হীরা দিয়ে তৈরী। কে বলেছে নকল?

এলিনা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো—আমি চাইনা ঐ লকেট—আপনি চলে যান। চলে যান এখান থেকে।

বনহুর অন্যদিন হলে এলিনার কথায় রাগ করতোনা এখন তার ব্যাপারটা তলিয়ে ভাববার মতো মনের অবস্থা ছিলোনা। বনহুর দারুন অপমানে লজ্জিত হলো, কারণ তার লকেটটা নকল হীরার নয়। সে বহু অর্থ ব্যয় করে এ লকেট সংগ্রহ করে এনেছে।

এলিনার তীব্র কণ্ঠস্বরে বনহুর যেন সম্বিৎ ফিরে পেলো। মিঃ লারলং এর হাত থেকে লকেটখানা নিয়ে বেরিয়ে গেলো দ্রুত কক্ষ থেকে।

মুহূর্তে কক্ষমধ্যে একটা গুঞ্জনধ্বনি স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

ভোলানাথ ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে এলো মিঃ লারলং এবং এলিনার পাশে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো সে —একি করলে এলিনা ভদ্রলোককে তুমি অপমান করলে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ কি লজ্জার কথা।

মিঃ লারলং এর মুখে কোনো কথা নেই, সে যেন কাষ্ঠ পুতুলের মত নির্বাক হয়ে গেছে।

এলিনা আর দাঁড়াতে পারে না, ছুটে চলে যায় নিজের কক্ষে। সশব্দে দরজা বন্ধ করে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদে। ফুলে ফুলে কাঁদে এলিনা। রাজকুর্মারিকে কেনো সে এভাবে অপমান করলো আর কেউ না বুঝুক সে জানে। তাকে এ ভাবে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়ার পিছনে কত বড় সাংঘাতিক একটা কারণ রয়েছে। মূল্যবান লকেটখানাকে কেনো সে নকল বলে উপেক্ষা করলো। কেনো—কেনো সে আজ রাজকুমারের প্রতি এমন কুৎসিৎ আচরণ করলো। কেউ না জানুক তার মন জানে, রাজকুমারকে সদ্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার আর যে কোনো পথ সে খুঁজে পাচ্ছিলোনা।

কিন্তু রাজকুমার কি মনে করলো! ছি ঃ ছিঃ তার আচরণে সে মনে কত বড় আঘাত পেয়েছে কি করে বোঝাবে তখন সে যা বলেছে তা সত্য নয়। মিথ্যা মিথ্যা অভিনয় করেছে সে তার সঙ্গে। অতোগুলি গণ্যমান্য ব্যক্তির সামনে যা বললো যা সে করলো, সেটা কি কোনো মানুষের কাজ হয়েছে। লোকজনই বা কি মনে করলো, রাজকুমার তখন তাদের সম্মুখ মাটিতে মিশে যাচ্ছিলো যেন।

এলিনা যতই ভাবে ততই তার অশ্রু বাধা মানেনা, কেমন করে রাজকুমারকে বুঝিয়ে বলবে ব্যাপারটা । আর বলবেই বা কি করে— সে সুযোগ কই।

আজকের এই আয়োজন এভাবে পন্ড হয়ে যাওয়ায় ভোলানাথ ও মিঃ লারলং অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়লো। রাজকুমারের জীবন নাশ করতে না পারায় ক্ষেপে উঠলো যেন তারা।

সেদিন উৎসব শেষ হলো বটে কিন্তু উৎসবে কোনো জৌলুস বা আনন্দ ছিলোনা।

বনহুর কক্ষে ফিরে এসে ক্ষিপ্তের ন্যায় পায়চারী শুরু করলো। এলিনার অসৎ ব্যবহার তাকে ভীষণভাবে মর্মাহত করে দিয়েছে। আসল হীরক লকেট এলিনা ওভাবে নকল বলে ছুড়ে ফেলে দেবার কারণ কি? তবে কি লোকজনের মধ্যে তাকে এইভাবে অপমান করাই তার মূল উদ্দেশ্য ছিলো? কিন্তু তাকে এভাবে অপমান করে এলিনার লাভ কি?

বনহুর সেদিন কিছুতেই ঘুমাতে পারলোনা। গোটা রাত তার কেটে গেলো অনিদ্রায়।

গভীর রাতে রেলিং এর পাশে এসে দাঁড়ালো বনহুর।

সমস্ত শহর সুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে।

আকাশে অসংখ্য তারার মেলা।

বাতাস বইছে এলোমেলো, কোনো সুদূর জঙ্গল থেকে শেয়ালের ডাক ভেসে আসছে। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে কুকুরের ঘেউ— ঘেউ আওয়াজ।

বনহুর রেলিংএ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আপন মনে সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চলেছে।

হঠাৎ অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়ালো বনহুরের পাশে। অন্যমনস্কভাবে সে চিন্তা করছিলো পাশে নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে চমকে ফিরে তাকালো গম্ভীর কণ্ঠে বললো—কে?

আমি।

মিস এলিনা আপনি!

হাঁ। আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। ক্ষমা করুন কুমার বাহাদুর আমি আপনাকে ইচ্ছা করে অপমান করিনি।

বনহুর তার হাতের অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটা দূরে নিক্ষেপ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

এলিনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে অন্ধকার হলেও বনহুর অনুভব করতে পারছে—তার চোখের পানি অঝোরে ঝরে পড়ছে।

বনহুর কোনো কথা বলেনা সে বুঝতে পেরেছিলো—এলিনা নিজের ভুল স্মরণ করে এসেছে তার কাছে ক্ষমা চাইতে। বনহুর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো এবার —মিস এলিনা আমি আপনাদের ভাড়াটিয়া। আমার সঙ্গে আপনাদের কোনো সম্বন্ধ নেই। অযথা আপনারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে---

কুমার বাহাদুর সে কথা বলতেই আমি আজ এসেছি। আমাকে আপনি ক্ষমা করুন বা না করুন আপনি চলে যান, চলে যান কুমার বাহাদুর। আর একটি দিন আপনি এখানে থাকবেন না। চলে যান এ শহর ছেড়ে---

বনহুর এমনি একটা সন্দেহ করেছিলো— এলিনার সেই ক্ষণটির আচরণের পিছনে কোন ইংগিৎ ছিলো। এবার বনহুর তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এলিনার মুখের দিকে। অন্ধকারে চক্‌চক্ করে উঠে বনহুরের গভীর নীল চোখ দুটি।

এলিনা বলে চলেছে—কুমার বাহাদুর, আপনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে; আপনি পালিয়ে যান। আপনি পালিয়ে যান এ শহর থেকে---

এলিনার মাথাটা নুয়ে আসে বনহুরের বুকে।

বনহুর পারেনা এলিনাকে দূরে সরিয়ে দিতে। হাত দিয়ে এলিনার চোখের পানির মুছিয়ে দিয়ে বলে আবার বনহুর —মিস এলিনা আমি চলে যাবো। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনি---

কুমার বাহাদুর, আমাকে আপনি নিয়ে যেতে পারেন না? এ পাপ পুরিতে আমি আর থাকতে পারছিনা! অসহ্য কুমার বাহাদুর কি অসহ্য যাতনা বুকে নিয়ে আমি বেঁচে আছি, কি বলবো আপনাকে

মিস এলিনা আপনি বেশি উত্তেজিত হচ্ছেন।

না, আমি যা বলছি সব সত্য। আমার বাবা হয়ে আমাকে কুৎসিৎ পথ অবলম্বন করাবার জন্য আগ্রহশীল। আপনি জানেন না কুমার বাহাদুর আমি কত সাবধানে নিজকে রক্ষা করে চলেছি। কিন্তু আর পারবো না, আর পারবো না আমি নিজকে বাঁচাতে। অর্থের লালসায় আমার বাবা আমাকে আলটা মডার্ণ মেয়ে করে গড়ে তুলেছে কিন্তু আমার অন্তরটা সত্যি সত্যি আলটা মডার্ণ নয়। আমি চাই সাধারণ মেয়েদের মত সুন্দর সুষ্ঠু একটি জীবন। স্বামী-সংসার সন্তান---

মিস এলিনা আপনি---

আমাকে বলতে দিন কুমার বাহাদুর। বলে যদি একটু শান্তি পাই। জানি আপনি আমার চেয়ে অনেক উচুতে, তবু এইটুকু আমার অনুরোধ আমাকে আপনি দয়া করে দূরে কোনো দেশে নিয়ে যান। যেখানে আমি একটু নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটাতে পারবো।

বনহুর এলিনার কথার কোনো উত্তর দিতে পারে না।

এলিনা বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠে।

পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বনহুর। এলিনার চোখের পানিতে সিক্ত হয়ে উঠে বনহুরের জামার আস্তিন।

❑

ভোরে ঘুম ভাংতেই বাবুর্চি ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে এলো বনহুরের কক্ষে—হুজুর, হুজুর, খুন--খুন--

বনহুরের কানে খু শব্দটা প্রবেশ করতেই ধড়মড় করে উঠে বসলো বিছানায়—খুন!

হ্যাঁ, হুজুর,দিদিমণি খুন হয়েছে।

মিস এলিনা খুন হয়েছে! বলো কি?

বনহুর দ্রুত শয্যা ত্যাগ করে স্লিপিং গাউনের বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো নীচে।

মিস এলিনার কক্ষের দরজায় চাকর-বাকরদের ভীড় জমে গেছে।

মিঃ লারলং যৌথ মাথায় আঘাত করে বিলাপ করছেন। তার চুল গুলো এলোমেলো টেনে ছিড়ছেন ভদ্রলোক তাঁর নিজের মাথার চুল।

বনহুর ভীড় ঠেলে কক্ষে প্রবেশ করলো।

বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখলো বনহুর—শয্যায় ছিন্ন লতার মত এলিয়ে পড়ে আছে এলিনা। সাদা ধপধপে বিছানার চাদরে জমাট বেঁধে আছে চাপ চাপ রক্ত।

বনহুর স্থির হয়ে তাকিয়ে রইলো। তার কানের কাছে যেন শুনতে পেলো এলিনার কণ্ঠস্বর--কুমার বাহাদুর আপনি আর একটি দিন এখানে থাকবেন না। চলে যান, চলে যান, এখান থেকে চলে যান--আপনার হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে। আপনি পালিয়ে যান, দূরে অনেক দূরে--আমাকে আপনি নিয়ে যেতে পারেন না সঙ্গে করে--- এ পাপ পুরিতে আমি আর থাকতে পারছি না। অসহ্য কুমার বাহাদুর কি অসহ্য যাতনা বুকে নিয়ে আমি বেঁচে আছি কি বলবো আপনাকে---

নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে পায় বনহুর নিজের কানে---মিস এলিনা আপনি বেশি উত্তেজিত হচ্ছেন---

এলিনার কণ্ঠ---না আমি যা বলছি সব সত্য। আমার বাবা হয়ে আমাকে কুৎসিৎ পথ অবলম্বন করাবার জন্য আগ্রহশীল। আপনি জানেন না কুমার বাহাদুর আমি কত সাবধানে নিজেকে রক্ষা করে চলেছি--বনহুর

এবার অস্ফুট কণ্ঠে বললো—মিস এলিনা আর নিজকে রক্ষা করতে পারলো না।

বনহুরের কাঁধে হাত রাখলো এক ভদ্রলোক —ঠিকই বলেছেন কুমার বাহাদুর এলিন শেষ পর্যন্ত নিজকে রক্ষা করতে পারলো না।

বনহুর অবাক হয়ে তাকালো ভদ্রলোকের মুখের দিকে। ইতিপূর্বে বনহুর তাকে আর একবার মাত্র দেখেছিলো এলিনার জন্ম উৎসবে। মুখে চাপ দাড়ি চোখে কালো চশমা মাথায় ক্যাপ ঠোঁটের ফাঁকে মোটা চুরুট।

বনহুর লোকটার আপাদমস্তক নিপুণ দৃষ্টি মেলে লক্ষ্য করে নিলো। তারপর বেরিয়ে যাচ্ছিলো কক্ষথেকে।

ভদ্রলোক বনহুরের পথ রোধ করে দাঁড়ালো—এতো তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছেন কেনো। আর একটু দাঁড়ান।

বনহুর কোনো কথা না বলে দ্রুত বেরিয়ে গেলো লোকটার পাশ কেটে।

বনহুরের কানে ভেসে এলো একটা হাসির শব্দ পিছন থেকে।

নিজ কক্ষে প্রবেশ করতেই বনহুর দেখতে পেলো রহমান তার জন্য অপেক্ষা করছে।

বনহুরকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে বললো সে —সর্দার মিস এলিনা নাকি খুন হয়েছে?

হাঁ রহমান। তুমি কার কাছে শুনলে খবরটা?

বাবুর্চির কাছে। কিন্তু মিস এলিনা হঠাৎ খুন হবার কারণ বুঝতে পারছি না সর্দার?

বনহুর একটা সোফায় বসে পড়লো, তারপর ব্যথিত কণ্ঠে বললো—রহমান আমিই এলিনার মৃত্যুর কারণ।

সর্দার।

হাঁ রহমান। নূরী নিজের জীবন দিয়ে আমাকে রক্ষা করে গেছে। এলিনাও বাঁচাতে চেয়েছে আমাকে। আমাকে বাঁচাতে চেয়েই সে নিজকে হারালো।

আমি ঠিক্ বুঝতে পারছিনা আপনার কথা?

সব শুনলেই বুঝতে পারবে। শোন তবে---বনহুর গত রাতের সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করলো রহমানের কাছে।

সব শুনে রহমানের মুখমন্ডল বিবর্ণ হলো, ভীত কণ্ঠে বললো রহমান—সর্দার, আর একটি দিনও আমি আপনাকে এখানে থাকতে দিতে পারিনা।

কিন্তু এলিনার হত্যাকারীর সন্ধান না নিয়ে তো আমি যেতে পারিনা রহমান। এলিনা আমাকে বাঁচানোর জন্য নিজের জীবন দিলো--দাঁতে দাঁত পিষে বলে উঠে বনহুর —এলিনার বুকে যে ছোরা বসিয়ে দিয়েছে আমি তার বুকের রক্ত নিতে চাই--

রহমান বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে। কতদিন পর আজ সর্দারকে তার স্বাভাবিক রূপে ফিরে আসাতে দেখে মনে মনে খুশীই হলো সে। নূরীর মৃত্যু সর্দারকে উন্মাদ উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছিলো। নূরীর শোকে এতোই মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলো যে নূরীর হত্যাকারীর প্রতিশোধ নেওয়ার কথাও তার অন্তরে দানা বাঁধেনি। আজ এলিনার মৃত্যু তাকে পুনঃ সম্বিৎ দানে সক্ষম হলো।

বনহুরের দক্ষিণ হাতখানা মুষ্টিবদ্ধ হলো—রহমান, আমি এলিনার হত্যাকারীর টুটি ছিঁড়ে ফেলবো, তারপর আমার স্বস্তি।

সর্দার, আপনি এখন স্বাভাবিক নন, এমত অবস্থায় কি করে আপনি এলিনার হত্যাকারীকে খুঁজে বের করবেন?

আমাকে করতেই হবে ---বনহুরের দৃঢ় কণ্ঠস্বর।

সেদিন রহমান কিছুতেই বনহুরকে ছেড়ে তার বাড়ীতে ফিরে গেলোনা। রয়ে গেলো সে এ বাড়ীতে।

কিন্তু বনহুর ক্রুদ্ধ হলো যখন সে জানতে পারলো রহমান এ বাড়ীতে রয়ে গেছে। রহমানকে ডেকে বললো এক সময়—রহমান তোমার কাজে তুমি চলে যাও। আমার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না।

সর্দার, আজকের দিনটা আমাকে এখানে থাকতে অনুমতি দিন।

সম্ভব নয়, তুমি যাও।

রহমান এরপর আর কোনো কথা বলতে পারলো না, চলে গেলো সে।

রহমান আর বনহুর যখন কথা হচ্ছিলো ঠিক তখন ওদিকের জানালার পাশ থেকে সরে গেলো একটি মুখ। সে মুখে হিংস্র পৈশাচিক নরহত্যাকারীর কঠিন ভাব ফুটে আছে। চোখ দু'টিতে প্রতিহিংসার আগুন যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

বনহুর না দেখলেও রহমান চলে যাওয়ার সময় অনুমান করলো, কেউ যেন সন্তর্পণে সরে গেলো পাশ থেকে। রহমান সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো নীচে। পরক্ষণেই শোনা গেলো তার টাঙ্গী চালানোর শব্দ।

এলিনার মৃতদেহ মরগে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ চলে গেলো। ধীরে ধীরে দিনের আলো নিভে রাতের অন্ধকার নেমে এলো পৃথিবীর বুকে।

বনহুর নিজের ঘরে পায়চারী করছে। গভীর চিন্তারেখা ফুটে উঠেছে তার ললাটে। দক্ষিণ হস্তের আঙ্গুলে ধুমায়িত সিগারেট।

সমস্ত বাড়ী খানা নিস্তব্ধতায় ভরে উঠেছে।

রাত দুটো বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট হয়েছে।

বনহুর কার যেন প্রতিক্ষা করছে বলে মনে হলো।

বার বার তাকাচ্ছে সে দরজার দিকে।

সন্ধ্যায় বনহুর যখন চা পান করছিলো তখন একটি বালক এসে তার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে যায়। চিঠিখানা এখনও পকেটে অবস্থান করছে।

বনহুর পায়চারী বন্ধ করে টেবিল ল্যাম্পের পাশে এসে দাঁড়ালো। সন্ধ্যায় পাওয়া চিঠিখানা বের করে মেলে ধরলো আলোর সামনে "রাত্রি আড়াই ঘটিকায় আসবো মোলাকাত হবে"

"অজ্ঞাত বন্ধু"।

বনহুর তাই দরজা খুলে প্রতিক্ষা করছিলো তার অজ্ঞাত বন্ধুর। চিঠিখানা পড়ে নিয়ে পকেটে রাখতেই বনহুর নিজের পিঠে শক্ত ঠান্ডা হিম-শীতল একটা কোনো বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করলো।

ফিরে তাকাতেই দেখলো—উদ্যত রিভলভার হস্তে মুখোস-পরা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে তার পিছনে।

বনহুর একটুও ভড়কালো না বা চমকালো না, স্বাভাবিক সচ্ছ কণ্ঠে বললো —তুমি ঠিক্ তোমার কথা অনুযায়ী আসতে পারোনি অজ্ঞাত বন্ধু। কয়েক মিনিট বিলম্ব হয়ে গেছে।

অজ্ঞাত বন্ধু এবার কথা বললো—কয়েক মিনিট বেশি বাঁচতে পারলে। একটা তোমার ভাগ্য।

সেজন্য আমি নিজকে গৌরবান্বিত মনে করছি অজ্ঞাত বন্ধু। কিন্তু আগমণের কারণ জানতে পারি কি?

নিশ্চয়ই পারো।

তবে বলো বন্ধু?

বনহুরের কথায় মুখোসের মধ্যে অজ্ঞাত বন্ধুর চোখ দুটো চক্ চক্ করে উঠলো, ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে সে—বোঝা গেলো তার নিশ্বাসের শব্দে।

বনহুর আবার বললো —কি চাও বন্ধু বলো—জীবন না অর্থ?

জীবন।

হাঃ হাঃ হাঃ লক্ষ টাকার বিনিময়ে আমার জীবন নিতে এসেছো তুমি, কিন্তু আমি যদি তোমাকে লক্ষ টাকা দেই?

মুখোস-পরা লোকটা বনহুরের হাসির শব্দে বোধ হয় একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলো, বনহুর দরজার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠলো—রহমান তুমি অসময়ে?

মুহূর্তের জন্য মুখোস-পরা লোকটা ফিরে তাকালো।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর তার হাত থেকে রিভলভারখানা এক ঝটকায় কেড়ে নিয়ে চেপে ধরলো ওর বুকে—খবরদার একটুও নড়বেনা।

মুখোস-পরা লোকটা ধীরে ধীরে হাত তুলে দাঁড়ালো, বনহুর দক্ষিণ হাতে লোকটার মুখের আবরণ টেনে খুলে ফেললো।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো—মিঃ লারলং আপনি!

লারলং এর চোখ দুটো ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠলো কোনো কথা বললো না।

বনহুর বললো—আমি ভেবেছিলাম আর একজনকে কিন্তু আপনি? বলুন মিঃ লারলং যৌথ নিশ্চয়ই আপনি ভাড়ার জন্য এসেছিলেন, তাই নয় কি? কিন্তু এতো রাতে ভাড়ার তাগাদায় আপনার নিজের আসা উচিৎ হয়নি। কারণ গত রাতেই আপনার কন্যার মৃত্যু ঘটেছে সে মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। কাজেই আপনার কন্যার অশরীরি আত্মা আপনার বাড়ীর আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে—যে তাকে হত্যা করেছে, তার টুটি ছিড়ে নেবে সে।

বনহুরের চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। দাঁতে দাঁত পিষে কথাগুলি উচ্চারণ করলো সে। পর মুহূর্তেই বনহুরের দক্ষিণ হস্তের রিভলভার মিঃ লারলং এর বুকে এসে ঠেকলো, কঠিন কণ্ঠে বললো সে—মিঃ যৌথ, আপনার কন্যার হত্যাকারী কে নিশ্চয়ই আপনি জানেন, এবং বলতে হবে কে সে?

আমি জানি না।

আপনার কন্যার হত্যাকারী তা হলে আপনি নিজে?

বলবো না।

বলতে হবে মিঃ লারলং?

যদি না বলি?

হত্যা করবো।

আপনি হত্যা করবেন আমাকে? আমার বাড়ীতে বসে আপনি আমাকে হত্যার হুমকি দেখাচ্ছেন কুমার বাহাদুর।

হুমকি নয় সত্যিই আপনাকে আমি হত্যা করবো এবং এই দণ্ডে---আমি তিনবার আপনাকে অনুরোধ করবো। তার পরই আপনার প্রাণহীন দেহটা লুটিয়ে পড়বে ধুলায়। বলুন, কে আপনার কন্যাকে হত্যা করেছে বলুন? বলুন?

দাঁড়ান দাঁড়ান বলছি---বলছি আমি--কিন্তু--

বনহুরের রিভলভার গর্জে উঠবার পূর্বেই মিঃ লারলং এর রক্তাক্ত দেহ মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো বনহুরের পায়ের কাছে।

বিস্মিত বনহুর ফিরে তাকাবার পূর্বেই কয়েকজন মুখোস পরা লোক উদ্যত পিস্তল হস্তে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে তাকে ঘিরে দাঁড়ালো।

প্রায় বিশ-পঁচিশ জন পিস্তলধারী লোক একসঙ্গে বনহুরের দেহ লক্ষ করে তাদের অস্ত্র বাগিয়ে ধরেছে।

বনহুর এভাবে কোনো দিন বিপদে পড়ে নাই।

বাধ্যহলো সে নিজ হস্তের রিভলভার ফেলে দিতে। মুখোস পরা লোকগুলির মধ্যে হতে এগিয়ে এলো একজন বনহুরের সম্মুখে। দাঁতে দাঁত পিষে বললো লোকটা—আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে তুমি বাঁচবে মনে করেছো? আমি তোমার বুকের হাড়গুলি টেনে ছিড়ে বের করে নেবো।

বনহুর অবাক কণ্ঠে বললো—তোমার মুখের গ্রাস আমি কেড়ে নিয়েছি?

হাঁ, মনে নেই আরাকান জঙ্গলের কথা?

বনহুরের মনের আকাশে ভেসে উঠলো নূরীর মুখখানা তবে কি এই সেই ব্যক্তি যে তার নূরীকে হত্যা করেছে!

বনহুরকে চিন্তা করতে দেখে বলে উঠে মুখোস-পরা লোকটা মনে পড়েছে আমার শিকার তুমি ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিলে?

হাঁ মনে পড়েছে। কিন্তু তাকে আমি তোমার কাছ হতে কেড়ে নেই নি। তুমি তাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছো। বনহুর হারিয়ে ফেলে তার স্বাভাবিক জ্ঞান, ভুলে যায় তার চার পাশে অসংখ্য পিস্তলধারী উদ্যত পিস্তল হস্তে দাঁড়িয়ে। চেপে ধরে বনহুর মুখোসধারীর গলা—বলো শয়তান কে তুমি? প্রচন্ড এক ঘুষি লাগিয়ে দেয় ওর মুখে।

লোকটার মুখের মুখোস খসে পড়ে বনহুর অবাক হয়ে দেখে এই সেই লোক যাকে এলিনার জন্মদিনে মিঃ লারলং যৌথের পাশে বসে গল্প করতে দেখেছিলো আর দেখেছিলো এলিনার মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বলেছিলো—"ঠিকই বলেছেন কুমার বাহাদুর এলিনা শেষ পর্যন্ত নিজকে রক্ষা করতে পারলোনা।" বনহুর বুঝতে পারলো এ হে হোক তার নূরীকে হত্যা করেছে। নূরীকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করেছিলো এই শয়তান। বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালো তার দিকে।

বন্দী সিংহের ন্যায় গর্জে উঠলো—নরপিশাচ তুমি শুধু নূরীর হত্যাকারীই নও, তুমি মিস এলিনাকেও হত্যা করেছো।

হাঁ, আমিই তোমার অজ্ঞাত বন্ধু কিন্তু আমি মিঃ যৌথকে দিয়ে তোমার মন পরীক্ষা করে দেখছিলাম। তুমি কম সুচতুর নও কিন্তু তোমার চেয়ে আমি অনেক বেশি বুদ্ধি রাখি।

তা তো তোমার কার্যকলাপে বুঝতে পারছি। তুমি আমার পূজনীয়। আমার নূরীর জীবন-প্রদীপ তোমার হস্তে নিভে গেছে। তোমাকে আমি---- অতিকষ্টে নিজকে সামলে নিলো বনহুর।

মুখোসধারী নিজের দাড়ি-গোফ জোড়া খুলে ফেললো—আমার নাম তুমি জানোনা কুমার বাহাদুর আমিই আরাকান সর্বশ্রেষ্ঠ ডাকু ভোলানাথ।

শুধু ভোলানাথ নই, আমি তোমার নূরীকে হত্যা করেছি; এলিনার বুকে ছোরা বসিয়ে দিয়েছি, যৌথের বুকে গুলী বিদ্ধ করে তার কণ্ঠ চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়েছি, এবার তোমার বুকের রক্ত শুষে নেবো কুমার-

ভোলানাথের কথা শেষ হয় না, আরাকানের পুলিশবাহিনী সহ কক্ষে প্রবেশ করে রহমান।

ইন্সপেক্টার কঠিন কণ্ঠে বলে উঠেন—হ্যান্ডস্ আপ।

মুহূর্তে কক্ষমধ্যে যেন একটা বজ্রপাত হয়, ভোলানাথ ও তার সঙ্গীগণের মুখ বিবর্ণ ফ্যাকাসে হয়ে উঠে। একটি শব্দ কারো মুখ দিয়ে বের হয়না।

বনহুরের মুখমন্ডলহাস্য-উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ইন্সপেক্টারের আদেশে পুলিশবাহিনী ভোলানাথ ও তার দলবলের হতে হাত কড়া পরিয়ে দিলো।

দুজন পুলিশ ভোলানাথের দলের হাতের পিস্তলগুলি নিয়ে এক জায়গায় জড়ো করে রাখলো।

ইন্সপেক্টার রহমানকে রক্ষা করে বললেন —রহমান, তোমার বুদ্ধি বলে আজ আমরা ডাকু ভোলানাথ ও তার দলবলকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলাম। এই শয়তানদের জন্য আরাকান শহরবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো। পথেঘাটে সদা-সর্বদা রাহাজানি নারী-হরণ, চুরি ডাকাতি লেগেই থাকতো। আজ শয়তান ভোলানাথের মুখে নিজ কানে শুনেছি—সে শুধু ডাকুই নয়, পর পর কয়েকটা নরহত্যা সে করেছে। কাজেই বিচারে মৃত্যুদন্ড তার সুনিশ্চিত। তারপর বনহুরের দিকে হাত বাড়ালেন ইন্সপেক্টার —কুমার বাহাদুর, আপনাকে ঠিক্ সময় উদ্ধার করতে পেরেছি সে জন্য আনন্দ বোধ করছি।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—ইন্সপেক্টার, আপনার কাছে চির কৃতজ্ঞ রইলাম।

হেসে বললেন ইন্সপেক্টার—আপনার ভৃত্য রহমান মিয়াই প্রথমে ধন্যবাদের পাত্র। আমি সরকারের তরফ থেকে তার মোটা বখশীসের ব্যবস্থা করে দেবো।

বনহুর আর রহমান একবার দৃষ্টি বিনিময় করলো।

রহমান বিনীত কণ্ঠে বললো —শুকরিয়া ইন্সপেক্টার সাহেব।

পুলিশবাহিনী মিঃ লারলং যৌথের লাশ পোষ্টমর্টেমের জন্য মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে বিদায় গ্রহণ করলেন।

সবাই বিদায় গ্রহণ করার পর বনহুর রহমানকে বুকে জড়িয়ে ধরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠে—আজ তোমার কাছে আমার পরাজয়। রহমান।

সর্দার, এ আপনি কি বলছেন।

হাঁ রহমান। তোমার কাছে আজ আমি নতি স্বীকার করছি।

দস্যু বনহুর এই প্রথম কোনো ব্যক্তির কাছে নিজ মুখে কথাটা উচ্চারণ করলো।

রহমানের চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো ফোঁটা ফোঁটা আনন্দ অশ্রু।

❑

মুখ ভার করে বসেছিলো মনি।

সম্মুখে ছড়ানো নানা রকম খেলনা। পুতুল, ঘোড়া, মোটর গাড়ী, চাবি দেওয়া রেলগাড়ী, ফুলঝাড়, বাঁশী, আরও কত রকম খেলনায় ভরে উঠেছে টেবিলটা। শুধু খেলনাই নয়, নানা রকমের খাবার —বিস্কুট, লজেন্স, চকলেট, সন্দেশ আরও কত কি। কিন্তু মনি কিছুই হাতে ধরছে না বা মুখে দিচ্ছে না।

চোখ দুটো ছলছল করছে ওর।

মনিরা আঁচলে মনির চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললো—একটু দুধ খাও বাবা।

না, আমি কিছু খাবো না। আগে আমার বাপি আর মাম্মিকে এনে দাও।

মরিয়ম বেগম হেসে বললেন—দাদু, এইতো মাম্মি। তোমার মাম্মিকে চিনতে পারছো না?

না, আমার মাম্মি নয়। আমার বাপি মাম্মিকে নিয়ে গেছে। আমাকে আমার বাপি আর মাম্মির কাছে নিয়ে চলো।

মনিরা দুধের গেলাস টেবিলে রেখে দু'হাতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে—উঃ আমি আমি পারবো না মামীমা, আমি পারবো না আর সহ্য করতে। ওকে পাঠিয়ে দাও ওকে পাঠিয়ে দাও ওর বাপি আর মাম্মির কাছে। আমি ওর কেউ নই, আমি ওর কেউ নই—

মরিয়ম বেগম মনিকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলেন—দাদু তুই জানিস্ না কে তোর মাম্মি? দেখছিস না তোর জন্য মা কাঁদছে?

মরিয়ম বেগমের কথায় মনি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো মনিরার দিকে। আবার বললেন মরিয়ম বেগম—নূর--লক্ষ্মী ছেলে---

মনি গম্ভীর গলায় বলে উঠলো—আমার নাম নূর নয়। আমি মনি।

বেশ, তুমি মনি। তোমাকে মনি বলেই ডাকবো। তাহলে দুধটুকু খেয়ে নাও? লক্ষ্মী দাদু আমার। তারপর মনিরাকে লক্ষ্য করে বললেন মরিয়ম বেগম—দাও মা, তোমার মনিকে দুধ দাও।

মনিরা আঁচলে অশ্রু মুছে টেবিল থেকে দুধের গেলাসটা তুলে নিয়ে মনির দিকে বাড়িয়ে ধরলো।

মনি লক্ষ্মী ছেলের মতো এবার দুধটুকু এক নিশ্বাসে খেয়ে গেলাসটা মায়ের হাতে ফিরিয়ে দিলো।

মরিয়ম বেগম বললেন—মনি বলো তো দাদু তোমার মাম্মি কে?

আমার মাম্মি এখানে নেই।

ঐতো তোমার মাম্মি, বলো —বলো মাম্মি?

না, ও আমার মাম্মি নয়। আমার মাম্মি খুব ভাল।

মনিরা বললো এবার —আর আমি বুঝি ভাল নই?

ছিঃ ও কথা বলতে নেই দাদু! তুমি তো এই মায়ের পেটে ছিলে। ওর কাছেই বড় হয়েছো?

না, আমি মাম্মির কাছে বড় হয়েছি। আমার মাম্মির কাছে আমি যাবো।

মনিরা রাগত কণ্ঠে বললো—দেখলে, দেখলে মামীমা। আমার নূরকে সেই রাক্ষসী কেমন করে পর করে দিয়েছে।

সব ঠিক হয়ে যাবে। সব ঠিক্ হয়ে যাবে মা।

মনিকে বুকে তুলে নিয়ে গালে চুমু দিয়ে বলেন মরিয়ম বেগম—তোমার মাম্মি আছে, আবার আসবে। এখন মার কাছে যাও। ও তোমার মা।

মনি তাকিয়ে থাকে, কোনো কথা বলেনা।

মনিরার বুক ফেটে কান্না আসে, দ্রুত বেরিয়ে যায় সে কক্ষ থেকে।

মরিয়ম বেগম নানাভাবে মনিকে বুঝাতে চেষ্টা করেন। এখন মনি আগের মাতো ছোট্টটি নেই, সবাইকে চিনবার মতো তার শক্তি হয়েছে। আর একবার যখন মনিকে খুঁজে পেয়েছিলো মনিরা তখন সে ছিলো ছোট্ট কচি বাচ্চা। তাই সে কোনো দিন মনিরাকে মা বলতে ভুল করেনি।

এবার মনি কিছুতেই মনিরাকে মা বা মাম্মি বলতে পারছিলো না। একটা সংস্কোচ তার কচি মনে বাধার সৃষ্টি করছিলো।

মা ও ছেলের মধ্যে এসেছিলো একটা বিরাটা ব্যবধান। মনিরা মনিকে যতই বুকে আঁকড়ে ধরতে যায় ততই মনি নিজকে সরিয়ে নেয় দূরে।

কিন্তু মরিয়ম বেগমকে মনি ভালবাসেন সেই অপরিচিত জায়গায় পরিচিত কাউকে না পেয়ে তাকেই সে অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেছে। মরিয়ম বেগমের কাছে থাকে সে। মরিয়ম বেগমের পাশে ঘুমায়।

মনিরা ব্যথা ভরা বুকে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে । দূর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

মরিয়ম বেগম মনিরাকে নির্জনে নিয়ে বুঝান —মা, সন্তানকে ফিরে পেয়েছিস সেইতো তোর ভাগ্য। একদিন ওর মনের ভ্রম ভেংগে যাবে। তুই মা—বুঝতে পারবে সে।

কিন্তু আমি যে আর সহ্য করতে পারছিনা মামীমা।

দুঃখ করিসনে। তুই তবু ফিরে পেলি তোর নয়নের মনিকে। আর আমি--আমার দিকে তাকিয়ে দেখতো—এই বুকটা আমার জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। কি আগুন আমি পেটে ধরেছিলাম যার জ্বালায় আমি জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেলাম--

মা! মাগো।

হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বরে এক সঙ্গে চমকে উঠলো মরিময় বেগম আর মনিরা। আনন্দে উজ্জ্বলা হয়ে উঠলো মুহূর্তে তাদের মুখমন্ডল।

দরজায় দাঁড়িয়ে বনহুর।

মরিয়ম বেগম অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন —মনির! বাবা তুই এসেছিস!

মা! বনহুর ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলো—তুমি ভাল আছো মা? তারপর মনিরার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললো—তুমি কেমন আছো মনিরা?

মনিরার চোখ দুটো অশ্রু ছল ছল হলো, অভিমানে মুখ ভার করে বললো—ভালো আছি।

বনহুর শয্যায় বসে বললো—মা, তোমার হাতে আমাকে এক গেলাস পানি খেতে দাও মা।

বাছা, একি চেহারা হয়েছে তোর? অসুখ করেনি তো?

না মা, অসুখ আমার করেনি।

তবে এমন চেহারা? মরিয়ম বেগম পুত্রের মাথায় মুখে-বুকে হাত বুলিয়ে দেন। তারপর বলেন—আমি তোর জন্য পানি আনছি আবার যেন পালিয়ে যাস নে।

আর পালাবো না মা। এখন থেকে আমি সব সময় তোমাদের কাছে থাকবো।

সত্যি বলছিস বাবা?

হাঁ, দেখো আর আমি যাবোনা।

মরিয়ম বেগমের অন্তরে একটা শান্তির ধারা বয়ে গেলো। তিনি খুশী মনে বেরিয়ে গেলেন তার মনিরের জন্য পানি আনতে। শুধু পানি নিয়েই ফিরবেন না, খাবারও আনবেন নিজ হাতে তৈরী করে।

স্বামীর সাদর সম্ভাষণের প্রতিক্ষা করছিলো মনিরা। ক্ষুব্ধ অন্তর তার লালায়িত হয়ে উঠেছিলো স্বামীর আবেগ-ভরা বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্য। কিন্তু আজ মনিরাকে বিফল হতে হলো।

বনহুর অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবছে।

মনিরা ব্যথা পেলো, এমন তো কোনোদিন হয়নি। মনিরা ভেবেছিলো—তার স্বামী মাকে পানি আনবার কথা বলে সুযোগ খুঁজছিলো হয়তো মনিরাকে কাছে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। সে কিন্তু মা চলে যাবার পর স্বামীর মধ্যে যখন একটা আনমনা ভাব লক্ষ্য করলো, তখন তো কোনো দিন তাকে দেখে নি মনিরা।

মনিরা আর দাঁড়াতে পারলো না, বেরিয়ে গেলো কক্ষ হতে। পুত্র মনির ব্যবহারেই মনিরা সর্বান্তকরণে মুষড়ে পড়েছিলো।আবার স্বামীর এই দারুণ উপক্ষোয় ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছা হলো তার। মনিরা বেরিয়ে গেলো নিজের কক্ষে—বালিশে মুখ গুজে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

মনিরা যখন কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায় তখন বনহুর একটু অন্য মনস্ক হয়ে পড়েছিলো, পরক্ষণেই ডাকে—মনিরা। মনিরা---

কিন্তু মনিরা তখন কোথায়--নিজের ঘরে বিছানায় বালিশে মুখ গুঁজে ফুপে ফুপে কাঁদছে।

মরিয়ম বেগম নাস্তার থালা আর গেলাস ভরা ঠান্ডা পানি নিয়ে আসেন। কক্ষে প্রবেশ করে মনিরাকে না দেখে বলেন—মা মনিরা মনিরা।

কথার ফাঁকে টেবিলে খাবার প্লেট রেখে বলেন —মনিরা গেলো কোথায় একটু খাওয়াবে।

বনহুর কোনো কথা না বলে পানির গেলাসটা হাতে তুলে এক নিশ্বাসে ঠান্ডা পানি পান করে গেলাস নামিয়ে রাখলো।

মরিয়ম বেগম বললেন—সেকি বাবা,শুধু পানি খেলি?

হাঁ মা, বড় পিপাসা। বড় পিপাসা---

মনিরা গেলো কোথায়?

চলে গেছে।

মনিরা চলে গেছে—কোথায় গেলো? বাবা তুই খা, একটু মুখে দে।

বনহুর মায়ের কথায় খাবার না খেয়েই বললো—মনি, কোথায় মা? কেমন আছে?

মনি ভালই আছে। সরকার সাহেবের সঙ্গে একটু বাইরে গেছে। তুই খেয়ে নে বাবা।

ক্ষুধা নেই মা, এখন কিছু খাবো না।

❑

আচ্ছা, তোমার কি হয়েছে বলো তো? কোনো দিন তো অমন ছিলে না? স্বামীর ভাবাপন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে বলে।

বনহুর আনমনে বসেছিলো জানালার পাশে। মনিরার কথায় চোখ তুলো তাকালো তার দিকে। কোনো কথা বললো না সে।

মনিরা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো আবার —মনি আমাকে চিনতে পারো না। তুমিও কেমন হয়ে গেছো! [illegible] কি নি[illegible] বেঁচে থাকবো---অমি কি নিয়ে বেঁচে থাকবো বলো?

মনিরার গন্ড বেয়ে গড়িয়ে প[illegible] অশ্রু।

বনহুর আবার মুক্ত জানালা দিয়ে তাকায় দূরে—অনেক দূরে বেলা শেষের সূর্য যেখানে অস্তমিত হচ্ছে।

স্বামীর এই উদাসীন ভাব মনিরার অন্তরে শেল বিদ্ধ করে চলেছে। আজ ক'দিন হলো এসেছে বনহুর কিন্তু একটিবার সে প্রাণ খুলে হাসে নি। সচ্ছ মনে কথা বলেনি মনিরার সঙ্গে। মনিরা লক্ষ্য করেছে— তার স্বামী নির্জনে বসে সব সময় কি যেন ভাবে। কারো পদশব্দে যেন চমকে উঠে, মনিরা পাশে থাকলে মুখভাব গম্ভীর হয়।

মনিরা সব সহ্য করে এসেছে—শুধু তার স্বামীর হাস্য-উজ্জ্বল মুখ স্মরণ করে আজও বেঁচে আছে সে।

পুত্রের এই আনমনা ভাব মরিয়ম বেগমকেও ভাবিয়ে তোলে আগে তো সে কোনো দিন অমন ছিলো না। সদা চঞ্চল-উচ্ছল স্বভাব ছিলো তার মনিরের। মা পুত্রের চিন্তিত ভাব লক্ষ্য করে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন।

সেদিন দ্বিপ্রহরে মরিয়ম বেগম নিজের ঘরে বসে বসে পত্রিকা দেখছিলেন, এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করে মনিরা। চোখে-মুখে একটা বিষন্নতার ছাপ।

কক্ষে প্রবেশ করে বলে মনিরা—মামীমা।

কে মনিরা আয় মা আয় কিছু বলবি?

মামীমা, আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না, ওর এই উদাসীনতা আমাকে পাগল করে তুলেছে। আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না মামীমা--

কি জানি মনিরের কি হয়েছে, আমি নিজেও যে ভেবে উঠতে পারছি না ও তো অমন ছিলো না কোনো দিন--মরিয়ম বেগম কথাগুলো অত্যন্ত ব্যথাপূর্ণভাবে বললেন।

মনিরা ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

এমন সময় বনহুর মনিকে কোলে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করলো। ডাকলো বনহুর মাকে —মা।

মনিরা তাড়াতাড়ি আঁচলে অশ্রু মুছে নিয়ে সরে বসলো।

বনহুর মনিকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বললো—মা, দেখো মনি কি সুন্দর গল্প বলতে শিখেছে।

গল্প? কই দাদু এসোতো শুনি?

মরিয়ম বেগম মনিকে টেনে নিলেন কোলের কাছে। আদর করে বললেন—কই কি শোনাবে এসো।

বনহুর চলে যাচ্ছিলো।

মরিয়ম বেগম পিছু ডাকলেন—বোস্ তোর সঙ্গে আমার কথা আছে। আচ্ছা দাদু তোমার গল্প পরে শুনবো, এখন মায়ের সঙ্গে ও ঘরে গিয়ে গল্প করো গে কেমন?

মনি ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালো।

মনিরা বুঝতে পারলো—মামীমা তাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য ইংগিত করলেন।

মনি এগিয়ে গেলো তার মায়ের পাশে। মনিরা ওকে সঙ্গে করে বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে।

মরিয়ম বেগম বললেন —বোস্ আমার কাছে।

বনহুর লক্ষ্মী ছেলের মতো বসে পড়লো মায়ের শয্যায়।

মরিয়ম বেগম এবার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—মনির তুমি কচি খোকা নও। সব তুমি বোঝ। ছোট বেলায় তোমাকে হারিয়ে আমার অন্তর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এখন যদি আমাকে সেই আগুন পোহাতে হয়--

ঐ তো পুরোন কথা মা।

কি হয়েছে মনির, আমি তোর মা—আমার কাছে লুকোবি না। বল্ কি হয়েছে তোর?

আমার। কই কিছু তো হয়নি?

হয়নি বললেই আমি বিশ্বাস করবো? আমি তোর মা আমাকে ছুঁয়ে বল্ তোর কিছু হয়নি?

মা!

মনির তোর উদাসীন ভাব শুধু আমাকেই ভাবিয়ে তোলে নি মনিরার মনে দাহ শুরু করেছে। কত দিন পর বাড়ী ফিরে এসেছিস কই প্রাণ খুলে কোনো দিন তো মনিরার সঙ্গে কথা বললি না? সে তোর স্ত্রী-স্বামীর ভাবাপন্ন ভাব নারীর কি যে যাতনাকর সে তুই বুঝবিনে।

মা আমি সব জানি, সব বুঝি। কিন্তু আমি পারি না প্রাণ খুলে হাসতে কথা বলতে।

কেনো! কি হয়েছে তোর?

আমি সব হারিয়েছি মা।

সব হারিয়েছিস তাতে দুঃখ কি। আমার তো কোনো অভাব নেই বাবা। তোর মতো এক গাদা সন্তান যদি আমার বসে বসে খায় তবু কারো কাছে হাত পাততে হবে না।

মা, তুমি বুঝবে না।

তুই কি চাস আমাকে বল্ আমি তাই দেবো তোকে।

পারবে না মা, পারবে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বনহুর।

মরিয়ম বেগম বুঝতে পারে তার সন্তান এমন কিছু হারিয়েছে যা সে আর পাবে না।

বনহুর উঠে বেরিয়ে যায় কক্ষ থেকে।

মরিয়ম বেগমের কক্ষ থেকে বনহুর বেরিয়ে আসতেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে মনি—বাপি!

আড়ালে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে দেখছিলো মনিরা।

বনহুর মনিকে কোলে তুলে নেয়।

মবি বলে উঠে—বাপি মা তোমাকে ডাকছে।

মা?

হাঁ, বাপি চলোনা মার কাছে।

বনহুরের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে মনি মনিরার কক্ষে।

মনিরা গম্ভীর মুখে খাটের পাশে গিয়ে বসেছিলো।

বনহুর আর মনি এসে দাঁড়ায়, মনির হাতের মুঠোয় বনহুরের হাত খানা।

মনি বলে—দেখো মা, আমি বাপিকে ধরে এনেছি।

আজ মনিরার বুখ ভরে যায় মনির মুখে মা সম্বোধন তার অন্তরে সুধা বর্ষণ করে।

ক'দিন থেকে মরিয়ম বেগম মনিকে বুঝিয়ে দিয়েছে মনিরাই তার জননী। ছোট বেলায় তাকে লোকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলো, তাই সে জননীর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। যাকে সে মাম্মি বলে ডেকেছে সে মা নয় সে মাম্মি —তার পালিত মা।

কথাটা মনির অন্তরে রেখাপাত করেছিলো, বাপিকে পেয়ে খুশী হয়েছিলো সে—বলেছিলো তার দাদীমার কথাগুলো সত্যি কি না।

বনহুর বলেছিলো—সব সত্যি। তোমার দাদীমা কি কোনো দিন মিথ্যা বলতে পারেন? আরাকানে যাকে তুমি হারিয়েছো —সে তোমার মা নয় মাম্মি। তোমার পালিতা মা।

মনি দাদীমার কথায় যতটা আশ্বস্ত হতে পারেনি, বাপির কথায় সে বিশ্বাস করেছিলো—মনিরাই তার মা।

শেষ পর্যন্ত মনিরাকে বলেছিলো মনি—তুমি সত্যিই আমার মা?

মনিরা নিজকে প্রকৃতিস্থ রাখতে পরেনি তখন, মনিকে বুকে চেপে ধরে বলেছিলো—বাপ আমার, আমি সত্যিই তোমার মা।

তারপর থেকে মনি'র মন আকৃষ্ট হয়েছিলো মায়ের দিকে।

মনিরা বলেছিলো —আমি তোমায় নূর বলে ডাকবো বাপ। আমার ডাকে সাড়া দেবে তো?

ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানিয়েছিলো মনি।

বনহুরের হাত ধরে মনি টেনে নিয়ে গেলো মায়ের পাশে—মা, দেখো বাপিকে ধরে এনেছি।

মা, সত্যি তুমি রাগ করেছো? বলো বলো, তাহলে আমাকে নূর বলে ডাকলে আমি কথা বলবোনা। মনি মুখ গম্ভীর করে রইলো।

মনিরা এবার কথা না বলে পারলোনা, বললো—আমি তোমার বাপির উপর রাগ করিনি নূর।

বাপি, মা তোমার উপর একটুও রাগ করেনি, দেখছোনা মা কেমন সুন্দর হাসছে।

বনহুর এবার বললো—আমিও তোমাকে নূর বলবো কেমন—রাগ করবেনা তো?

না-না-না, আমি নূর—আমি নূর--যাই দাদীমা আমাকে ডাকছে নূর বেরিয়ে যায়।

বনহুর বসে পড়ে মনিরার পাশে দক্ষিণ হস্তে মনিরার চিবুক উঁচু করে ধরে বলে —লক্ষ্মীটি আমার উপর রাগ করেছো?

মনিরা হঠাৎ স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে উচ্ছসিতভাবে কেঁদে উঠে। কোনো কথা বলতে পারেনা সে।

পাশের ঘরে তখন মরিয়ম বেগম আর নূরের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। নূর বলছে—দাদীমা আমাকে এখন থেকে নূর বলে ডেকো মা বলেছে নূর নাকি খুব সুন্দর নাম।

আচ্ছা দাদু, আমিও তোমাকে নূর বলে ডাকবো। কিন্তু তোমাকে আর একটা কাজ করতে হবে, বলো করবে?

নিশ্চয়ই করবো, বলো দাদীমা?

বলছি, কাজ মানে সোজা কাজ—পড়াশোনা করা।

ওঃ এই কথা। তুমি বুঝি জানোনা দাদী মা, আমি কত পড়তে পারি।

তাই নাকি? আচ্ছা, আজকেই আমি সরকার সাহেবকে বলবো তোমার জন্য বই কিনে আনতে।

আমি স্কুলে ভর্তি হবো দাদীমা।

বেশতো, কালকেই তোমাকে স্কুলে ভর্তি করে দেবো। লেখাপড়া শিখে মস্ত-বড় নামকরা মানুষ হবে, কেমন?

নূর তখনই পাশের টেবিল থেকে একটা বই নিয়ে দাদীমার বিছানায় উঠে বসে, এই দেখো আমি সব অক্ষর চিনি।

চমৎকার আমার দাদু, আমি তো কিছু চিনিনা, তুমি আমাকেও শেখাবে বুঝলে?

শেখাবো, নিশ্চয়ই শেখাবো। জানো দাদীমা আমি লেখাপড়া শিখে কি করবো?

কি করবি দাদু?

পাশের ঘরে সব শুনতে পাচ্ছিলো বনহুর আর মনিরা।

স্বামীর বুকে মাথা রেখে চোখ বুজে ছিলো সে।

বনহুর ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো মনিরার মাথায়।

মরিয়ম বেগমের কথায় বললো নূর—আমি লেখাপড়া শিখে মস্ত বড় পুলিশ অফিসার হবো। মস্ত -মস্ত দস্যুকে আমি গ্রেপ্তার করবো ---

মনিরা শিউরে উঠলো, তাকালো স্বামীর মুখের দিকে।

মরিয়ম বেগমের অন্তরটাও কেঁপে উঠলো শিশু নূরের কথায়। তার কোনো কথা আর শোনা গেলো না।

❑

গভীর রাতে ঘুম ভেংগে যায় মনিরার। পাশ ফিরতেই চমকে উঠে, শিউরে উঠে তার অন্তর। শুন্য বিছানা, স্বামী তার পাশে নেই। আশঙ্কা ভরা আকুল হৃদয় নিয়ে উঠে বসে ব্যাকুল আঁখি মেলে তাকায় কক্ষমধ্যে চারিদিকে।

একটা বেদনা মোচড় দিয়ে উঠে মনিরার হৃদয়ে।

মনিতো এখন তার দাদীমার কাছে শোয়, তার বিছানায় একমাত্র তার স্বামী ছিলো। এই গভীর রাতে কোথায় গেলো তবে সে! তবে কি পালিয়ে গেছে— মনিরা চিন্তিতভাবে উঠে দাঁড়ালো শয্যা ত্যাগ করে। দরজায় দৃষ্টি পড়তেই বিস্মিত হলো দরজা অর্দ্ধ ভেজানো রয়েছে।

মনিরা ছুটে গেলো দরজার পাশে, দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বাইরে —মামীমা, মামীমা---

মরিয়ম বেগমের ঘুম ভেংগে গেলো. দ্রুত কক্ষ থেকে বেরিয়ে মনিরার আকুল ভরা কণ্ঠস্বরে ভয়াতুরভাবে বলে উঠলেন —কি হয়েছে মনিরা? কি হয়েছে?

মামীমা, সে চলে গেছে।

মরিয়ম বেগম স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বললেন—জানতাম ওকে ধরে রাখা যাবে না।

মনিরা ডুকরে কেঁদে উঠলো।

মরিয়ম বেগম মনিরার পিঠে-মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

মরিয়ম বেগম উঠে আসতেই নূরের ঘুম ভেংগে গিয়েছিলো। নূরও এসে দাঁড়ালো সেখানে ,বললো সে —দাদীমা, মা মণি কাঁদে কেনো?

মরিয়ম বেগম নূরকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন—তোমার বাপি চলে গেছে।

—বাপি চলে গেছে? তাই মা-মনি কাদছে বুঝি?

হাঁ নূর, তোমার বাপি চলে গেছে তাই তোমার মা-মণি কাঁদছে।

নূর এবার মনিরার পাশে গিয়ে নিজের হাত দিয়ে তার চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে বললো—কেঁদোনা মা-মণি বাপি চলে গেছে আমি তো আছি। আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না।

মনিরা নূরকে বুকে চেপে ধরে অস্ফুট কণ্ঠে বললো—বাপ আমার।

মরিয়ম বেগম একটা শান্তির নিশ্বাস ফেললেন।

❑

এখানে যখন মনিরা শিশু নূরকে বুকে আঁকড়ে ধরে সান্তনা খুঁজছিলো তখন তাজের পিঠে বনহুর ছুটে চলেছে। বন-প্রান্তর পেরিয়ে উল্কা বেগে ছুটছে রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে এগুচ্ছে তাজ।

তাজের জমকালো দেহটা যেন মিশে গেছে নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে। বনহুরের শরীরে নাইট ড্রেস। কারণ সে ঘুম থেকে জেগেই পালিয়েছে, নাইট ড্রেসটা পাল্টে নেবার সময়ও তার হয়নি।

বনহুর যেদিন তার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয়েছিলো, তাজের পিঠেই গিয়েছিলো সে। তাজ সেদিন হতে চৌধুরী-বাড়ীর বাগান মধ্যে অবস্থান করছিলো।

মনিরাও তাজকে আদর করতো, স্বামীর সঙ্গে তাজের পাশে দাঁড়িয়ে ওর গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে দিতো। কখনও বা নিজের হাতে ছোলা-ঘাস খাইয়ে দিতো। শুধু মনিরাই নয় মাঝে মাঝে তাজের কাছে যেতেন মরিয়ম বেগম। কিন্তু নিকটে যেতে সাহসী হতেন না। তাজের বিরাট উচ্চতা আর তার চক্‌চকে জমকালো চেহারা মরিয়ম বেগমের মনে একটা ভীতির সৃষ্টি করতো।

তাজকে মরিয়ম বেগম ভয়ও করতেন, যেমন তেমনি তাজের বলিষ্ঠ সুন্দর দেহটা দেখে মনে মনে আনন্দ বোধ করতেন গর্বে ভরে উঠতো তার বুক—দস্যু বনহুরের অশ্বই বটে।

নিস্পলক নয়নে তাকিয়ে থাকতেন তিনি তাজের দিকে। জীবনে তিনি কত অশ্ব দেখেছেন কিন্তু এমন অশ্ব তিনি কখনও দেখেননি। তাজকে দেখলে লোকের মনে সন্দেহ জাগতে পারে তাই মরিয়ম বেগম সরকার সাহেবকে বলে দিয়েছিলেন, তাজকে বাগানবাড়ীতে হেফাজতে লুকিয়ে রাখতে।

প্রতিদিন ফজরের নামাজান্তে মরিয়ম বেগম বাগানবাড়ীতে যেতেন, দূর থেকে তাজকে তিনি দেখতেন। খুশীতে মন তার ভরে উঠতো।

এটা মরিয়ম বেগমের কতকটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিলো। অন্যান্য দিনের মতো আজও মরিয়ম বেগম এসে দাঁড়ালেন বাগান বাড়ীতে। যেখানে তাজ বাধা থাকতো সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন নিষ্পলক নয়নে। শূন্য জায়গাটা খাঁ খাঁ করছে। মরিয়ম বেগমের মুখমন্ডল বিষন্ন-মলিন হয়ে উঠলো, একটা ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠলো তাঁর মনের মধ্যে। গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়লো ফোটা ফোটা অশ্রু।

এমন সময় নূর এসে দাঁড়ালো তার পাশে বললো—দাদীমা, তাজ কোথায় গেলো? ওকে তো দেখছিনা!

চলে গেছে দাদু।

কেনো গেলো? আমার বাপির সঙ্গে গেছে বুঝি!

হাঁ তোমার বাপির সঙ্গে তাজও চলে গেছে।

আবার কবে আসবে?

নূরের কথায় কোনো জবাব দিতে পারলেন না মরিয়ম বেগম। আঁচলে অশ্রু মুছে নিয়ে বললেন—চলো দাদু, সরকার দাদার সঙ্গে আজ স্কুলে যাবে।

স্কুলের কথায় খুশী হলো নূর, পড়াশোনায় নূরের অত্যন্ত আগ্রহ। আরাকান স্কুলে সে তার সঙ্গীদের মধ্যে পড়াশোনা বা খেলাধুলায় ছিলো সেরা ছাত্র। নূরের সুন্দর চেহারা আর তার সর্বদিকে গুণাগুণ দেখে স্কুলের মাষ্টার গণ মুগ্ধ হয়ে যেতেন।

মরিয়ম বেগম নূরকে নিয়ে ফিরে গেলেন অন্দর বাড়ীতে।

তারপর সরকার সাহেবকে বলে কান্দাই স্কুলে ভর্তি করে দিলেন মরিয়ম বেগম তার একমাত্র সন্তানের স্মৃতি-চিহ্ন নূরকে।

নূরকে নিয়ে মরিয়ম বেগম আর মনিরা গড়তে লাগলো কতো আশার স্বপ্নে। নূর লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে, একদিন তার সুনাম ছড়িয়ে পড়বে গোটা শহরে।

মরিয়ম বেগম ভাবলেন—পুত্রকে নিয়ে তার বাসনা পূর্ণ হয়নি। পুত্রের সন্তানকে নিয়ে রচনা করবেন এক কল্পনার রাজ্যে।

মনিরাও নূরকে পেয়ে উপস্থিত স্বামীর কথা ভুলে থাকতে চেষ্টা করতে লাগলো। মনকে ভরসা দিলো এমন তো আরও কতদিন চলে গেছে আবার ফিরে এসেছে তার পথে।

কিন্তু মনিরা এবার অন্যান্য বারের মত আশ্বস্ত হতে পারলো না কারণ এবার সে স্বামীকে যেন সর্বান্তকরণে পায়নি, কোথায় যেন একটা বাধা তাদের উভয়ের মধ্যে প্রাচীর সৃষ্টি করেছিলো। স্বামীর আনমনা উদাসীন ভাব মনিরার অন্তরে শুধু ব্যথাই দেয়নি, একটা অসহ্য জ্বালা অনুভব করেছে সে মনে।

স্বামীর পূর্বের আচরণ স্মরণ করে হাহাকার করে উঠেছে মনিরার হৃদয়। কোথায় যেন হারিয়ে গেছে তার স্বামী। পাশে পেয়েও যেন না পাওয়ার শূন্যতা তাকে অস্থির করে তুলেছে। কত কথা কত হাসি গান ছিলো মনিরার মনের গহনে কিন্তু স্বামীর ব্যবহারে সব নিঃশেষ হয়ে শুকিয়ে গিয়েছিলো—এতোটুকু প্রকাশ করতে পারেনি সে।

মনিরার পাশ থেকে যখন তার স্বামী চলে গেলো তখন সে শুধু অশ্রু বিসর্জনই করে নি, স্বামীকে সে যেন আজ নূতন করে হারালো।

❑

চোরের মত চুপি চুপি পা টিপে টিপে রহমানের কাছে এসে দাঁড়ালো নাসরিন। চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিয়ে বললো সে—রহমান ভাই, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো ঠিক জবাব দেবে?

রহমান তার রাইফেলটা পরিস্কার করছিলো, নাসরিনের কথায় মুখ না তুলেই বললো—দেবার মত হলে নিশ্চয়ই দেবো।

নাসরিন তার একবার এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললো—আচ্ছা রহমান ভাই, সর্দারের কি হয়েছে বলতে পারো?

এবার রহমান সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকালো নাসরিনের মুখে। রহমানের মুখমন্ডল গম্ভীর হয়ে উঠেছে বললো ধীর শান্ত গলায়—সর্দারের মনের অবস্থা ভাল নেই নাসরিন।

তাতো দেখতেই পাচ্ছি। সব সময় নির্জনে বসে কি যেন ভাবনে, যেখানে বসে থাকেন আর যেন উঠতে চান না। কই আগে তো তিনি কোনোদিন এমন ছিলেন না? এবার তাকে সব সময় ভাবাপন্ন দেখছি। কি হয়েছে তার বলোনা রহমান ভাই?

একটা অভাব তাকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে নাসরিন, যে অভাব তার কোনদিন পূরণ হবে না।

কি এমন অভাব বলোনা রহমান ভাই?

একটা দীর্ঘশ্বাস রহমান চেপে গেলো যেন!

নাসরিন বললো—শুধু সর্দারকেই নয়, এবার তোমরা ফিরে আসার পর তোমাদের দু'জনাকেই কেমন যেন সদা সর্বদা উদাসীন লাগে তোমারও যেন কিছু হয়েছে। তবে কি তুমিও কিছু হারিয়েছো?

সর্দারের অভাবটা আমার বুকেও শেল বিদ্ধ করেছে নাসরিন। আমি নিজকেও সর্দারের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছি।

নাঃ তোমার হেয়ালী ভরা কথা আমি কিছু বুঝতে পারছিনা। কি হয়েছে তোমাদের দু'জনার বলবে তো?

শুনলে তুমিও ভেংগে পড়বে নাসরিন তাই কথাটা তোমাকে বলা হয়নি। শুধু তোমাকেই নয় আস্তানার কেউ জানেনা ও কথা।

কি এমন কথা যা বলতে তোমাদের এতো আপত্তি? অথচ তোমরা উভয়ে হৃদয়ে হৃদয়ে গুমড়ে মরছো সেই গোপন কথাটার জন্য। সর্দার কি কোনো মেয়েকে ভালবেসে ফেলেছেন?

সর্দার নতুন করে কাউকো ভালবাসেননি তবে ভালবাসার জনকে হারিয়েছেন।

সেকি! সর্দার কি তবে বৌ-রাণীকে---

না।

তবে?

নাসরিন, নূরীর মৃত্যু ঘটেছে।

নূরীর মৃত্যু ঘটেছে। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো যেন নাসরিন।

রহমান অতিকষ্টে নিজকে সামলে নিয়ে বললো—তোমরা জানো আমি নূরীকে দূরে কোনো গোপন স্থানে লুকিয়ে রেখেছি। কিন্তু আসলে নূরী ইহজগতে আর বেঁচে নেই।

উঃ এ সব তুমি কি বলছো রহমান ভাই?

নাসরিনের চোখ দুটো দিয়ে পানির ধারা নামলে কাঁদতে লাগলো নাসরিন। নূরীকে সে শুধু ভালই বাসতো না নূরী তার ছোট বেলার সঙ্গী সাথী। এক সঙ্গে খেলা-ধুলা করে এতো বড় হয়েছিলো ওরা। আজ সেই নূরীকে হারিয়ে নাসরিন যেন ভেংগে পড়লো কান্নায়!

কিছুক্ষণ পর নাসরিন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেলো।

রহমান বললো—নূরীর শোকে সর্দার মুষড়ে পড়েছেন নাসরিন। একটু থেমে পুনরায় বললো সে—আগে জানতাম না তাকে এতো ভালবাসতেন সর্দার।

হাঁ সত্যি বলছো রহমান ভাই—নূরীকে সর্দার এতো ভালবেসেছিলো আগে বুঝতে পারিনি।

রহমান আর নূরী নিশ্চুপ হয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

রহমানই বললো আবার —নূরীর মৃত্যু-সংবাদ আস্তানায় কাউকে বলো না তুমি। দাইমা কথাটা শুনলে সব সময় কান্নাকাটি করবে। এতে সর্দারের মনের অবস্থা আরও খারাপ হবে।

বেশ আমি কাউকে বলবো না। কিন্তু সর্দার নূরীর জন্য যেভাবে ভেংগে পড়েছে তাতে আমাদের আস্তানা কেমন করে টিকবে রহমান ভাই?

আমিও সেই চিন্তায় অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছি। সর্দার যদি এভাবে মুষড়ে পড়েন। তাহলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। শুধু আমাদের আস্তানা আর

দলবলই ভেংগে যাবে না সমস্ত দেশে আবার শুরু হবে ভদ্র নামি ভন্ড শয়তানদের পৈশাচিক নৃত্য। যারা দেশের জনগণের মঙ্গলের নামে তাদের বুকের রক্ত শুষে শুষে খায় আবার তারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে।

তাহলে কি করবে রহমান ভাই?

সেই কথা আমাকেও ভয়ানকভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। কি করে সর্দারের মনের অবস্থা ফেরানো যায়? আমি সর্দারকে অনেকভাবে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তার মা এবং বৌ-রাণীর কাছে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানেও তিনি টিকতে পারেননি। আমি সব জানি—বৌ-রাণীর সঙ্গে সর্দার এবার বড় উদাসীনভাবে কথাবার্তা বলেননি। তাই ভাবছি একি হলো নাসরিন একি হলো?

অত্যন্ত দুশ্চিন্তার কথা রহমান ভাই বৌ-রাণী আর তার মাও সর্দারকে স্বাভাবিক করতে পারেননি।

নাসরিন আর একটা কথা তোমাকে বলবো জীবন গেলেও তুমি কাউকে বলবে না।

বলো, বলবো না।

নাসরিন তোমাকেও বলতাম না কথাটা কিন্তু না বলে যে আমি পারছি না সহ্য করতে।

তুমি বলো রহমান ভাই আমি জীবন গেলেও কাউকে বলবো না।

যা অসম্ভব তাই আমি করেছিলাম। সে অপরাধের জন্য আমিই দায়ী। দোষ নেই কোনো সর্দারের--

কি হয়েছে বলো না?

নূরীকে আমি ভালবাসতাম জানো?

জানি তুমি তাকে গভীরভাবে ভালবাসতে।

কিন্তু নূরী আমাকে কোনোদিন ভালবাসতে পারেনি।

হাঁ, আমাকে সে অনেকদিন বলেছিলো এ কথা। বলতো নূরী—নাসরিন, জানিস আমি কত বড় হৃদয়হীন। রহমান আমাকে কত ভালবাসে কিন্তু আমি ওকে একটুও ভালবাসতে পারি না। সত্যিই ওর জন্য আমার বড় করুণা হয়। কিন্তু কি করবো মনের সঙ্গে তো যুদ্ধ চলে না।

তোমাকেও সে বলেছিলো তাহলে কথাটা?

হাঁ বলেছিলো—আরও বলেছিলো—হুরকে আমি ভালবেসেছি। ওকে মন-প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছি। কি করে আমি আর একজনকে ভালবাসবো। আর কাউকে ভালবাসবার পূর্বে আমার যেন মৃত্যু হয়।

নাসরিনের কথায় রহমানের চোখ দুটো হঠাৎ অদ্ভুতভাবে দপ দপ করে উঠলো। বললো রহমান—নাসরিন নূরীর বাসনা সফল হয়েছে। যা সে চেয়েছিলো প্রাণভরে পেয়েছে। তার কামনার জনকে একান্ত আপন করে পেয়েছিলো--

সর্দার তাকে--

হাঁ নাসরিন আমিই তাকে সর্দারের হাতে সঁপে দিয়েছিলাম খোদাকে স্বাক্ষী করে। আর স্বাক্ষী ছিলো আরাকান জঙ্গলের বৃক্ষ লতা পাতা জীবজন্তু।

নাসরিনের দু'চোখে বিস্ময় ঝরে পড়তে লাগলো। কোনো কথা তার মুখ দিয়ে উচ্চারণ হলো না।

রহমান বলে চললো—সেই আরাকানে সর্দার আর নূরী রচনা করলো সোনার স্বর্গ। কিন্তু সে স্বর্গ আজরাইলের এক ফুৎকারে ভেংগে চুরমার হয়ে গেলো। সর্দারের বুক থেকে আরাকান বাসি ডাকু ভোলানাথ ছিনিয়ে নিলো নূরীকে। তীর বিদ্ধ করে হত্যা করলো তাকে।

উঃ কি নিদারুন সংবাদ। উঃ আমিই সহ্য করতে পারছিনা। আমিই সহ্য করতে পারছিনা রহমান ভাই। নূরীর স্মতি আমাকে পাগল করে তুলেছে।

রহমান এবার স্থির কণ্ঠে বললো—কিন্তু ভেংগে পড়লে তো চলবে না। ধৈর্য ধরতে হবে, যে গেছে সে আর ফিরে আসবেনা কিন্তু রক্ষা করতে হবে আমাদের সর্দারকে।

সত্যি রহমান ভাই, সর্দারের মনোভাব সচ্ছ না হলে আমাদের সবকাজ পন্ড হয়ে যাবে।

কিন্তু কি করা যায় কি করে সর্দারের মনকে স্বাভাবিক করে তোলা যায়? এক কাজ করতে পারবে নাসরিন?

বলো কি করতে হবে?

সর্দারের সেবা-যত্নের ভার তুমিই গ্রহণ করবে। যাতে তার মনোভাব ধীরে ধীরে আবার স্বাভাবিক হয় সেই চেষ্টা করবে তুমি। কেমন পারবে তো?

পারবো।

নাসরিন এখন তুমিই ভরসা আমি জানি বৌ-রাণী যা পারেনি তুমি তা পারবে।

নাসরিন কোনো কথা বললো না।

রহমান বললো—যাও নাসরিন, সর্দার তার কক্ষে আছেন। তিনি এখনও কিছু মুখে দেননি। তারজন্য খাবার নিয়ে যাও।

আচ্ছা যাচ্ছি।

নাসরিন চলে যায়।

কিন্তু অল্পক্ষণ পরে ফিরে আসে নাসরিন মুখে -চোখে তার উদ্বিগ্নতার ছাপ—রহমান ভাই, সর্দার তার কক্ষে নেই।

সর্দার তার কক্ষে নেই! বলো কি? একটু পূর্বেই তাকে তার কক্ষে দেখে এসেছি। চলো দেখি কোথায় গেলেন তিনি।

রহমান আর নাসরিন মিলে সমস্ত আস্তানা তন্ন তন্ন করে খুঁজলো কিন্তু কোথাও তারা সর্দারকে খুঁজে পেলোনা।

রহমান ছুটে গেলো ঘোড়াশালে। আরও অবাক হলো সে—সর্দার নেই তাজও নেই। এবার বুঝতে পারলো রহমান—সর্দার তাজকে নিয়ে উধাও হয়েছে। কোথায় গেছে কে জানে।

সর্দারের অন্তর্ধানে সমস্ত আস্তানায় একটা গভীর অশান্তির ছায়া ঘনিয়ে এলো, বিশেষ করে রহমান মুষড়ে পড়লো দুশ্চিন্তায়।

❑

বনহুর আজ তার নিজের ড্রেসে সজ্জিত হলো। শরীরে জমকালো ড্রেস, মাথায় কালো পাগড়ী মুখে গালপাট্টা বাঁধা। কোমরের বেল্টে রিভলভার। পায়ে কালো বুট।

তাজের পাশে এসে দাঁড়ালো বনহুর।

তাজ প্রভুকে দেখতে পেয়ে আনন্দে সম্মুখের পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করেতে লাগলো।

বনহুর উঠে বসলো তাজের পিঠে।

আবার সেই পথ সেই মাঠ-প্রান্তর -বনানী ঢাকা কত পল্লী। সব ছাড়িয়ে বনহুর তাজের পিঠে উল্কাবেগে ছুটে চলেছে। বনহুরের গন্তব্য স্থান সেই আরাকান জঙ্গল।

যে জঙ্গলে নূরী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে।

বনহুর একটা অজ্ঞাত। আকর্ষণে ছুটে চলেছে কে যেন তাকে হাত ছানি দিয়ে ডাকছে। কিছুতেই সে নিজকে ধরে রাখতে পারছে না।

মাথার উপরে প্রখর সূর্য অগ্নিবর্ষণ করছে যেন।

নীচে মৃত্তিকা গণগণে সীসার মতো তীব্র জ্বালাময় হয়ে উঠেছে। বনহুরের সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে চুপসে উঠেছে। বারবার হাতের পিঠে ললাটের ঘাম মুছে নিচ্ছিলো সে।

পিপাসায় কণ্ঠ শুকিয়ে উঠছিলো, ক্ষুধায় নাড়ী হজম হবার জোগাড় কিন্তু কোনোদিকে খেয়াল নেই বনহুরের।

পথে কোন বৃক্ষলতা না থাকায় এতোটুকু ছায়ার চিহ্ন ছিলো না যেখানে বনহুর তার অশ্ব নিয়ে একটু বিশ্রাম করে নেবে।

তাজ প্রভুর কষ্ট বেশ উপলব্ধি করতে পারছিলো তাই সে দ্রুত—আরও দ্রুত ছুটছিলো।

তাজও হাঁপিয়ে পড়েছিলো অত্যন্ত। আজ ক'দিন সে অবিরত ছুটেছে। পথে দু'দিন কেটে গেছে আজ তৃতীয় দিন।

বেলা গড়িয়ে আসতেই বনহুর এক পর্বতের পাদমূলে এসে পৌছলো।

এটাই আরাকানের প্রথম সীমানা, আরাকান পর্বত।

অদূরে পর্বতটার পাদমূলে অসংখ্য নাম-না-জানা বৃক্ষলতা গুল্ম। মাঝে মাঝে উচুনীচু টিলা মাথা উচু করে দাঁড়ি আছে। একটা বিরাট অশথ বৃক্ষের নীচে এসে বনহুর তাজের পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো।

বনহুর বৃক্ষতলে দাঁড়িয়ে তাকালো চারিদিকে। অত্যন্ত পিপাসা বোধ করলো সে। কিন্তু কোথায় পানি—শুকনো মাটির বুক যেন খা খা করছে।

বৃক্ষতলে দাঁড়িয়ে প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিলো। একটা শীতল বাতাস তার সমস্ত শরীর জুড়িয়ে দিয়ে গেলো। বনহুর অনেকটা শান্তিবোধ করলো এবার। তাজকে পাশে বেঁধে বৃক্ষতলে বসে পড়লো। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো সে। হাতের উপর মাথা রেখে চীৎ হয়ে শুয়ে পড়লো বনহুর, অল্পক্ষণেই নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লো।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে খেয়াল নেই হঠাৎ একটা সুমিষ্ট গানের সুরের আবেশে ঘুম ভেঙ্গে গেলো বনহুরের। চোখ মেলে তাকালো —কোন দিক থেকে সুরটা ভেসে আসছে শুনতে চেষ্টা করলো।

উঠে বসলো বনহুর। অস্পষ্ট একটা গানের সুর দূরে—বহু দূরে থেকে যেন ভেসে আসছে।

তন্দ্রাচ্ছন্নের মত বনহুর কান পেতে শুনতে লাগলো। সুরটা এখনও সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। বনহুরের হৃদয়ে এ সুরের রেশ এক মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি করে চললো। বনহুর এবার উঠে দাঁড়ালো, সুরের টানে এগিয়ে চললো সে আরাকান পর্বতের দিকে।

পিছনে গাছের ডালের সঙ্গে তাজের লাগাম বাঁধা রয়েছে। বনহুরকে মন্থর গতিতে তন্দ্রাচ্ছন্নের মত পর্বতের দিকে এগুতে দেখে তাজ চঞ্চল হয়ে উঠলো। পশু-প্রাণ হলেও সে যেন বুঝতে পারলো—তার প্রভু কোনো অজানার পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

তাজ সম্মুখের পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে লাগলো।

কিন্তু বনহুর ফিরেও তাকালো না সে যেন কোনো যাদুমন্ত্রে এগুচ্ছে।

ঝোপ-ঝাড় আগাছা জঙ্গল পেরিয়ে বনহুর অগ্রসর হলো। ছোট ছোট টিলাগুলি পড়ে রইলো পিছনে। পর্বতের গা বেয়ে উঠতে লাগলো বনহুর উপরের দিকে।

গানের সুর আরও স্পষ্ট হয়ে ভেসে আসছে।

বনহুরের মুখমন্ডল দীপ্তময় হয়ে উঠেছে এ যেন তার অতি পরিচিত সুর। কত দিন যেন সে এ সুর শুনেছে যে সুর গাঁথা হয়ে রয়েছে তার অন্তরের অন্তরে।

বনহুর তন্দ্রাচ্ছন্নের মত এগুচ্ছে।

ললাটে ফুটে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চোখ দুটো উজ্জ্বল দীপ্তময়, সুরের রেশ স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

পর্বতের কন্দরে কন্দরে সেই সুরের প্রতিধ্বনি করুণ কান্নার মতো ঝরে পড়ছে।

অপূর্ব অদ্ভূত সে সুর।

কোনোদিকে খেয়াল নেই বনহুরের, শুধু সুরের টানে সে অগ্রসর হচ্ছে।

ঘনজঙ্গলে পর্বতের গা আচ্ছন্ন।

তেমনি ঝাপসা অন্ধকার চারিদিক ঘোলাটে করে তুলেছে। বনহুরের শরীরে কাঁটার আঁচড় লেগে রক্ত ঝড়ে পড়তে লাগলো। জামা ছিঁড়ে গেলো, পাগড়ীর কোনো কোনো অংশ কাঁটার বিঁধে রইলো। তবু চলেছে সে, অতি মন্থর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বনহুর সামনের দিকে।

এমন সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আসে।

কখন যে আকাশে ঘন মেঘ জমে উঠেছিলো সেদিকে খেয়াল করতে পারেনি বা খেয়াল হয়নি বনহুরের।

দমকা বাতাস প্রচন্ড বেগে এগিয়ে আসছে। যেন শত শত রাক্ষস হুঙ্কার দিয়ে ছুটে আসছে তার দিকে।

ভীষণ ঝড় শুরু হলো।

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

এতোক্ষণ যে সুর বনহুরকে আকৃষ্ট করে টেনে নিয়ে চলেছিলো সে সুরের রেশ থেমে গেছে, হারিয়ে গেছে যেন প্রচন্ড ঝড়ের মধ্যে।

বনহুরের কানে এখনও যে সুরের প্রতিধ্বনি জেগে রয়েছে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো এগুচ্ছে সে সম্মুখের দিকে।

মস্ত মস্ত গাছ পালাগুলো মড় মড় শব্দে ভেংগে পড়ছে।

কোনো কোনো গাছ সমূলে উপড়ে পড়ে যাচ্ছে বিরাট দৈত্যের নিহত দেহের মতো।

কোনোদিকে খেয়াল নেই বনহুরের।

তখনও সে এগিয়ে যাচ্ছে, দেখতে চায় বনহুর—কে সেই সুরের অধিকারিণী কে সেই মায়াময়ী।

ঝড়ের বেগ আরও বেড়ে যাচ্ছে।

বনহুর কখনও হোচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, কখনও উঠেছে আবার এগুচ্ছে সম্মুখ দিকে। পর্বতটার গা বেয়ে অনেকখানি উপরে উঠে এসেছে সে।

বনহুর এখন এমন একস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে থেকে পর্বতের পাদমূল অনেক নীচে। ওপাশেই পর্ব্বতের গা বেয়ে মস্ত বড় একটা ফাটল। ফাটলের তলদেশে খরস্রোতা এক নদী।

এতো জোরে ঝড়ো হাওয়া শুরু হয়েছে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছেনা বনহুর। শুকনো পাতা আর ধূলো রাশিরাশি তার দৃষ্টিশক্তিকে অন্ধ করে দিচ্ছে। সম্মুখে দু'হাত প্রসারিত করে এগুচ্ছে সে।

জীবনে কোনোদিন বনহুর এমন ঝড়ের কবলে পড়ে নি। পর্বতের গায়ে সেকি ভয়ঙ্কর তুফান।

এখানে বনহুর ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলছিলো।

ওদিকে তাজ গাছের ডালের সঙ্গে বাঁধা লাগামটা প্রাণপণ চেষ্টায় ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছিলো।

তাজের দেহে অসীম বল। দস্যু বনহুরের অশ্ব সে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাজ লাগাম ছিঁড়ে ফেললো।

ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে সে ছুটতে শুরু করলো যেদিকে তার প্রভু চলে গেছে। পশু হলেও তাজের বুদ্ধিবল ছিলো অদ্ভুত। তাজ এতো বিপদেও নিজকে বাঁচানোর চেষ্টা না করে প্রভুর সন্ধানে অগ্রসর হলো। কিন্তু এলোমেলো দমকা ঝড়—তাজ বেশি দূর এগুতো সক্ষম হলোনা। তাছাড়াও পর্বতটা বেশ খাড়া তাজ পর্বত বেয়ে উপরে উঠতে পারছিলো না।

তাজ বার বার পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে লাগলো।

বনহুর তখন তাজের নিকট হতে অনেক দূরে উপরে উঠে গেছে। ঝড়ের মধ্যে বনহুরের একবার মনে পড়লো তাজের কথা। কিন্তু বেশিক্ষণ কিছু চিন্তা করবার মতো এখন পরিবেশ নয়।

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে প্রবল, বৃষ্টিপাত শুরু হলো।

পর্বতের গায়ে কিছুতেই বনহুর নিজকে ধরে রাখতে পারছিলোনা এদিকে ঝড় আর একদিকে বৃষ্টি, বনহুরের পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকাও কঠিন হয়ে উঠেছিলো।

হঠাৎ বনহুর তাকালো সম্মুখে, বিদ্যুতের আলোতে যেন অস্পষ্ট দেখতে পেলো—দূরে একটি গুহার মুখে দাঁড়িয়ে আছে তার নূরী, শুভ্রবসন এলোচুল আঁচলখানা ঝড়ের বেগে উড়ছে।

বনহুর ভুলে গেলো ঝড়বৃষ্টি আর প্রচন্ড জলস্রোতের কথা। দু'হাত প্রসারিত করে ছুটে গেলো—নূরী—নূরী--

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর পড়ে গেলো সম্মুখস্থ ফাটলের মধ্যে। প্রচন্ড জলরাশি গর্জন করে নীচের দিকে ছুটে চলেছে, সেই জলস্রোতের মধ্যে বনহুর তলিয়ে গেলো কোন্ অতলে।

পরবর্তী বই

বনহুরের অন্তর্ধান

বনহুরের অন্তর্ধান-২২

❑

গভীর রাত্রির নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে প্রতিধ্বনি জাগে—খট্ খট্ খট্ খট্.....

আস্তানায় বিশ্রাম করছিলো রহমান। সেদিন সর্দারের নিরুদ্দেশের পর আজ পর্যন্ত তার কোনো সন্ধান নেই। কান্দাই জঙ্গল থেকে কান্দাই শহর রহমান চষে ফিরেছে, কোথাও সর্দারের সন্ধান পায়নি। সমস্ত অনুচর সর্দারের'খোঁজে দেশ হতে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। তন্ন তন্ন করে সন্ধান চালিয়েছে তারা শহরে-নগরে-বন্দরে। আবার সবাই এক এক করে ফিরে এসেছে—কেউ জানেনা কোথায় তাদের সর্দার।

সেদিনের পর থেকে রহমানের চোখের ঘুম অন্তর্ধান হয়েছে। সদা-সর্বদা ঐ এক চিন্তা, সর্দার কাউকে কিছু না বলে গেলো কোথায়? বনহুরের মনে অশান্তির কথা আর কেউ না জানলেও জানে রহমান, কাজেই সর্দারের জন্য রহমান আশঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

হঠাৎ অশ্বপদ-শব্দে রহমান চমকে উঠে, অন্যান্য অনুচর-গণের মনেও দোলা লাগে, এ শব্দ যে তাদের অতি পরিচিত! দস্যু বনহুরের অশ্ব তাজের পদশব্দ এটা।

রহমান সুড়ঙ্গ মুখে দাঁড়ায়। দূরবীণ চোখে লাগিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কিন্তু অন্ধকারে কিছুই সে দেখতে পায় না।

আস্তানায় সার্চলাইট জ্বেলে দেওয়া হলো। যেদিন থেকে অশ্বপদ-শব্দ আসছিলো সেই দিন সার্চলাইটের আলো পড়তেই রহমান বিস্ময়ে চমকে উঠলো, তাজ বেগে ছুটে আসছে—কিন্তু তার পিঠ শূন্য।

রহমান সুড়ঙ্গপথের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

ক্রমে তাজের পদশব্দ স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। অল্পক্ষণেই তাজ এসে দাঁড়ালো। একি! তাজের লাগাম এমন ছেঁড়া কেন? অর্দ্ধেকটা লাগাম তাজের মুখের মধ্যে ঝুলছে।

রহমান তাজের পিঠে-গলায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—ওরে, সর্দারকে তুই কোথায় রেখে এলি? বল, ওরে বল্......

তাজ যেন রহমানের কথা বুঝতে পারলো, সম্মুখের পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে লাগলো সে, কোনো কথা যেন তাজ তাকে বুঝিয়ে বলতে চায়।

রহমান এবং আরও অন্যান্য অনুচরগণ এসে তাজকে ঘিরে দাঁড়ালো। সকলের চোখেই বিস্ময়, তাজের লাগাম এভাবে অর্দ্ধেকটা ছিন্ন কেন।

তাজ পশু, সে বলতে পারলো না—জবাব দিতে পারলো না বনহুরের অনুচরদের কাছে।

বনহুর যখন তাজকে গাছের গুড়ির সঙ্গে বেঁধে রেখে বিশ্রাম করছিলো, ঠিক তখন তার কানে ভেসে এসেছিলো পরিচিত একটি সুর। তন্দ্রাগ্রস্তের মত যখন সে অগ্রসর হয়েছিলো, এগিয়ে গিয়েছিলো গহন বনের দিকে।

তারপর আর ফিরে আসেনি বনহুর।

ঝড় উঠেছিলো—সেকি ভীষণ তুফান! আকাশ গাঢ় মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিলো, গাছ-পালা মড়-মড় শব্দে ভেংগে পড়ছিলো। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছিলো জলস্রোত। তাজ নিজকে আর স্থির রাখতে পারেনি, তুফানের ঝাপটায় সে অস্থির হয়ে পড়েছিলো। শেষ পর্যন্ত লাগাম ছিড়ে ছুটে ছিলো মনিবের সন্ধানে।

পাহাড়ের পাদমূলে এসে আর সে উঠতে পারেনি উপরে। অনেক চেষ্টা করেছিলো তাজ, অনেক খুঁজেছিলো সে প্রভুকে। যখন সে প্রভুর কোনো সন্ধান পেলো না, তখন সে ছুটলো কান্দাই অভিমুখে। পথে কোনো বাধা-বিঘ্নই সে মানলো না, অবিরাম ছুটে কয়েকদিন পর সে তাদের আস্তানায় এসে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। তাজের মুখের সঙ্গে ঝুলছে এখনও সেই ছিন্ন লাগাম-খানার খানিকটা অংশ।

রহমান অনুমানে বুঝে নিলো—নিশ্চয়ই তাদের সর্দারের কোনো বিপদ হয়েছে। না হলে তাজ এভাবে এক—কখনও ফিরে আসতো না। তাছাড়া তাজের যে অবস্থা তাতে বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—তাজ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।

রহমান তার কয়েকজন সেরা অনুচর সহ তাজের সঙ্গে অশ্ব নিয়ে আবার আরাকান অভিমুখে রওনা দিলো।

সুচতুর তাজ সর্বাগ্রে ছুটলো, পিছনে রহমান দুল্‌কীর পিঠে। অন্যান্য অশ্বপৃষ্ঠে আর আর অনুচরগণ।

আরাকানে পৌঁছে রহমান দলবল নিয়ে সমস্ত বন-জঙ্গল পাহাড় প্রান্তর সব নিপুণভাবে খুঁজলো। তাজ যেদিকে চলে সেই দিকেই রহমান ছোটে তার দলবল নিয়ে।

এমন কোনো যায়গা রইলো না যেখানে রহমান সন্ধান করলো না তাদের সর্দারের!

কিন্তু কোথায় বনহুর? পৃথিবীর বুকে থাকলে রহমানের চোখে সে নিখোঁজ হতে পারবে না।

□

এদিকে রহমান যখন বনহুরের সন্ধানে আরাকানের মাটি তন্ন তন্ন করে ফিরছে, তখন বন্ধাই এর গভর্ণর হাউসে ভীষণ এক ডাকাতি হয়ে যায়। দুর্দান্ত দস্যু বনহুরই এই দস্যুতা করেছে পুলিশ রিপোর্টে এই রকম বলা হয়েছে। দস্যু শুধু অর্থ আর ধন-সম্পদই লুটে নিয়ে যায়নি, গভর্ণর কন্যা মিস্ এরুনাকেও হরণ করে নিয়ে গেছে।

দস্যু বনহুর গভীর রাতে বন্ধাই এর গভর্ণর হাউসে প্রবেশ করে কয়েকজন পুলিশ এবং পাহারাদারকে নিহত এবং আহতও করেছে।

বন্ধই এর এই ভীষণ ডাকাতি-সংবাদ শুধু বন্ধাইতেই সীমাবদ্ধ রইলো না, দেশ হতে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়লো। এতোবড় দস্যুতা কয়েক বছরের মধ্যে এই প্রথম হলো। কি ভাবে গভর্ণর হাউসে সশস্ত্র পাহারা পরিবেষ্টিত থাকা সত্বেও দস্যু প্রবেশ করে গভর্ণর মিঃ রাজেন্দ্র ভৌমকে অজ্ঞান করে তাঁর যথাসর্বস্ব নিয়ে পালিয়েছে তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

পুলিশ মহলে সাড়া পড়ে গেছে।

সমস্ত পুলিশ অফিসার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন, টেলিগ্রাফে খবরটা প্রতিটি পুলিশ অফিসে পৌছে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ অফিসে অফিসে আবার পড়ে গেছে সাজো সাজো রব।

শুধু এক দেশেই নয়—প্রত্যেকটা দেশে দস্যু বনহুরের নামে আঁতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ মহলই শুধু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েনি, প্রতিটি দেশের মানুষের বুকে কম্পন শুরু হয়েছে। বেশ কিছুদিন দস্যু বনহুরের অত্যাচার থেকে তারা মুক্ত ছিলো, আবার আঁতঙ্ক সৃষ্টি হলো সকলের মনে।

কান্দাই শহরের পুলিশ মহলও জেগে উঠলো, দস্যু বনহুর আবার উপদ্রব শুরু করলো! এতোদিন বেশ নিশ্চিন্ত মনেই পুলিশ অফিসারগণ নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছিলেন।

হঠাৎ করে আবার এই সংবাদে দেশের আবহাওয়া যেন পাল্টে গেলো। সবাই সজাগ হয়ে উঠলো আপন আপন কাজে।

বন্ধাই থেকে ডাক এলো পুলিশ সুপার মিঃ আহম্মদ ও মিঃ জাফরীর।

মিঃ আহম্মদ ও মিঃ জাফরী এ ক'মাসে যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। তেমন কোনো কাজ না থাকায় অস্বস্তি বোধ করছিলেন তাঁরা। দস্যু বনহুরের পুনঃ আবির্ভাবে আবার সজাগ হয়ে উঠলেন। কর্মময় জীবন তাঁদের, বসে থাকার জন্য নয়।

মিঃ আহমদ ও মিঃ জাফরী বন্ধাই অভিমুখে রওনা দিলেন। সঙ্গে তাঁদের কয়েকজন অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার রইলো। বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে না পারায় মিঃ জাফরীর মনে দারুণ একটা ক্ষোভ ছিলো। তিনি এবার বদ্ধপরিকর হলেন, দস্যু বনহুরের পুনঃ আবির্ভাব যখন ঘটেছে তখন একবার দেখে নেবেন—দস্যু বনহুর মানুষ না অশরীরি আত্মা। তাকে এবার গ্রেপ্তার না করে ছাড়বেন না কিছুতেই। দস্যু বনহুর তাকে যে নাকানি চুবানি খাইয়েছে তা তিনি কোনোদিন ভুলবেন না। দস্যু বনহুরের প্রতি তার শুধু রাগই নেই, ভীষণ আক্রোশ আছে, ওকে প্রেপ্তার করতে না পারলে তিনি কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছেন না।

কান্দাই ছেড়ে পৃথক এক দেশ বন্ধাই।

যদিও প্লেনে যাওয়া-আসার সুবিধে আছে তবু মিঃ আহম্মদ ও মিঃ তাঁদের সহকারীদের নিয়ে জলপথে রওনা দিলেন।

কান্দাই বন্দর থেকে জাহাজযোগে বন্ধাই যাবেন মনস্থ করে নিলেন পুলিশ সুপার মিঃ আহম্মদ আর মিঃ জাফরী। নিজেদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড়লেন।

কান্দাই থেকে বন্ধাই এ পৌঁছতে সপ্তাহ কয়েক লেগে যাবে। পথে বন্দরে বন্দরে জাহাজ নোঙর করবে। মিঃ আহম্মদ এবং জাফরীর ইচ্ছা—তাঁরা এ সব বন্দরে অবতরণ করে নানারূপ সন্ধান চালিয়ে খোঁজখবর নেবেন।

জাহাজ 'শাহান শাহ' বন্দর ত্যাগ করবার পূর্বে মিঃ আহম্মদ ও মিঃ জাফরী ক্যাপ্টেন জমরুদীর সঙ্গে গোপনে কিছু আলাপ করে নিলেন।

মিঃ জাফরী ক্যাপ্টেন জমরুদীকে বললেন—দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারে উদ্দেশ্যে আমরা বন্ধাই রওনা দিলাম বটে, কিন্তু আপনার সাহায্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

ক্যাপ্টেন জমরুদীর মুখে স্মিত একটুকরো হাসি ফুটে উঠলো, তিনি গম্ভীর স্থির কণ্ঠে বললেন—দস্যু বনহুর গ্রেপ্তারে আমি আপনাদের সর্বান্তকরণে সাহায্য করবো।

থ্যাঙ্ক ইউ ক্যাপ্টেন; আপনার সহযোগিতাই হবে আমাদের এ যাত্রার একমাত্র কামনার বস্তু।

'শাহান শাহ' কান্দাই এর সর্বশ্রেষ্ঠ জাহাজ। যাত্রীবাহী এ জাহাজে প্রায় পাঁচ শত লোক এক সঙ্গে আরোহণ করতে পারে। সুন্দর সুসজ্জিত মনোরম এই জাহাজখানায় এমন কিছুর অভাব নেই, যা যাত্রিদের অসুবিধেয় ফেলতে পারে। দোকান-পাট, বাজার, হোটেল, এমন কি সিনেমা হলও রয়েছে 'শাহান শাহে'।

এহেন সর্ব উৎকৃষ্ট জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন মিঃ জমরুদী বয়স পঞ্চাশের বেশি হবে। বলিষ্ঠ সুঠাম গঠন, দীপ্ত উজ্জ্বল চোখ। মুখে ছাট্ করা দাড়ি। দু'চারটে চুলে পাক ধরেছে। দাড়িও পেকেছে মাঝে মাঝে। ক্যাপ্টেন জমরুদী গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, কথা কম বলেন—কাজ করেন বেশি।

জাহাজে তিনি আরোহীদের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করেন। ক্যাপ্টেন হয়েও তিনি সমস্ত জাহাজের সর্বত্র ঘুরে ফিরে দেখাশোনা করেন, কারও কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা নিজে খবর রাখেন।

মিঃ আহম্মদ ও মিঃ জাফরী অফিসারদ্বয়ের জন্য সুসজ্জিত দু'টি ক্যাবিনের ব্যবস্থা করে দিলেন এবং নিজে সব সময় তাঁদের খোঁজখবর নিতে লাগলেন।

কান্দাই বন্দর ত্যাগ করে জাহাজ 'শাহান শাহ' সাগরবক্ষে অগ্রসর হলো।

গভীর নীল উচ্ছল জলরাশি প্রচন্ড আস্ফালন করে তীর-বেগে ছুটে এসে আছড়ে পড়ছে জাহাজের গায়ে। ভীম গর্জন করে জাহাজখানা এগিয়ে যাচ্ছে সাগরের মধ্যস্থানে।

ক্রমে কান্দাই বন্দর ঝাপসা হয়ে এলো, এক সময় অদৃশ্য হলো বন্দরটা সম্পূর্ণরূপে।

ডেকে দাঁড়িয়ে সিগারেট পান করছিলেন মিঃ আহম্মদ। মিঃ জাফরী দাঁড়িয়েছিলেন পাশে। দৃষ্টি তাঁদের সীমাবদ্ধ দূরে সাগর আর আকাশখানা যেখানে মিশে এক হয়ে গেছে।

মিঃ জাফরী বললেন মিঃ আহম্মদকে লক্ষ্য করে—স্যার, দস্যু বনহুর বেশ কিছুদিন ডুব মেরে থাকার পর আবার সে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

সেই কারণেই আমরা বন্ধাই চলেছি মিঃ জাফরী; আশা করি আমরা এবার তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হবো।

এমন সময় ক্যাপ্টেন জমরুদীর আগমনে চুপ হলেন পুলিশ অফিসারদ্বয়, বিশেষ করে যখন-তখন দস্যু বনহুরের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করাটা ভাল লাগলো না তাঁদের।

ক্যাপ্টেন জমরুদী বললেন—চলুন বৈকালের নাস্তাটা আমার ওখানেই করবেন।

মিঃ আহম্মদ এবং মিঃ জাফরী অমত করতে পারলেন না। কারণ এ জাহাজে আরোহণ করার পর ক্যাপ্টেনের ব্যবহারে তাঁরা মুগ্ধ।

মিঃ আহম্মদ ও মিঃ জাফরী ক্যাপ্টেন জমরুদীকে অনুসরণ করলেন।

জাহাজখানা তখন ভীম গর্জন করে বিরাট জলজন্তুর মত সাগরবক্ষে এগিয়ে চলেছে।

মন্থনা দ্বীপের মহারাজ জয়কান্ত সেন আহার নিদ্রা সব ত্যাগ করেছেন। মহারাণী মায়াবতীর অবস্থাও তদ্রুপ। পুত্রশোকে মুহ্যমান রাজদম্পতী।

রাজকুমার প্রদীপ সেনের অভাবে সমস্ত মন্থনা দ্বীপ ঝিমিয়ে পড়েছে। রাজ্যময় একটা অশান্তির ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। রাজার মনে সুখ নেই, প্রজাদের আনন্দ থাকবে কি করে।

রাজবংশের একমাত্র দীপশিখা প্রদীপ কুমার।

জয়কান্ত সেন বহুদিন নিঃসন্তান থাকার পর কোনো এক সন্ন্যাসীর আশীর্বাদে লাভ করেছেন প্রদীপকে। মহারাজ এবং মহারাণীর শিবরাত্রির সলতে প্রদীপ কুমার। একমাত্র সন্তানকে তাঁরা কোনো সময় দৃষ্টির আড়াল হতে দিতেন না। শুধু মহারাজ এবং মহারাণীই নয়, সমস্ত রাজপরিবারের নয়নের মণি ছিলো প্রদীপ।

প্রজারা ভালবাসতো, সমীহ করতো—রাজকুমারের আচরণে মুগ্ধ ছিলেন তারা।

প্রদীপ কুমার শুধু সুন্দরই ছিলো না, তার হৃদয় ছিলো বড় উদার। শিকার করা ছিলো প্রদীপের নেশা।

মাঝে মাঝে প্রদীপ কুমার তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে শিকারে যেতো। বন হতে বনান্তরে ছুটতো অশ্ব নিয়ে।

প্রতিবারের মত এবারও প্রদীপ শিকারে গিয়েছিলো সঙ্গীদের নিয়ে।

সঙ্গে শুধু সঙ্গীরাই ছিলো না, প্রদীপ কুমারের দেহরক্ষী ছিলো অনেক।

শিকার করা রাজকুমারের নেশা হলেও রাজরাণী এতে সব সময় উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করতেন। না জানি কখন কোন্ বিপদ এসে পড়ে। একমাত্র সন্তানের অমঙ্গল চিন্তায় রাজদম্পতী সদা-সর্বদা চিন্তিত থাকতেন। ছোট শিশু নয় যে ধরে রাখবেন। বয়স হয়েছে—এখন প্রদীপ যুবক।

মহারাজ জয়কান্তা সেন এখন বৃদ্ধ; রাজ্য চালনায় তিনি আর আগের মত উৎসাহী নন। এখন পুত্র প্রদীপকে রাজ্যভার সমর্পণ করে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করতে চান।

কিন্তু প্রদীপের ইচ্ছে ঠিক তার উল্টো, রাজ্যভার গ্রহণ করতে সে কিছুতেই রাজী নয়, আরও কিছু পরে সে এ দায়িত্ব গ্রহণ করবে বলে পিতার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

মহারাজ জয়কান্ত এবং মহারাণীর ইচ্ছা—পুত্রের অমতে তাঁরা জোরপূর্বক কিছু করবেন না।

প্রদীপ ভালবাসে মন্ত্রীকন্যা মীরা দেবীকে, মীরাও প্রদীপের জন্য সদা ব্যাকুল।

মহারাজার ইচ্ছা না থাকলেও মহারাণীর অনুরোধে তিনি পুত্রকে মন্ত্রীকন্যা মীরা দেবীর সঙ্গেই বিয়ে দেবেন মনস্থ করে রেখেছেন। মন্ত্রি চন্দ্রনাথ জাতীকুলে মহারাজের সমকক্ষ। কন্যা মীরা অপূর্ব রূপবতী, সর্বগুণে গুণবতী—কাজেই মহারাজের অমত করবার কোনো কিছু রইলো না। মীরাকে পুত্রবধু করে নেবেন মনস্থ করে রাখলেন।

মীরা আর প্রদীপের মধ্যে তাই ছিলো না কোনো বাধার প্রাচীর। উভয়ে মিলিত হতো উভয়ের সঙ্গে, হাসি-গানে মেতে উঠতো ওরা! জোছনা রাতে নদীবক্ষে বজরা ভাসিয়ে চলে যেতো দুরে, অনেক দূরে। কখনও বা ছিপ নৌকায় রাজকুমার আর মন্ত্রিকন্যা বেরিয়ে পড়তো, মাছ ধরতো বড়শী নিয়ে। কোনো কোনো সময় বনে যেতো ওরা শিকার করতে প্রদীপ কুমারের সঙ্গে মীরাও পরতো শিকারীর ড্রেস। প্রদীপ আর মীরার মধ্যে ছিলো না কোন সংকোচ বা দ্বিধা। উভয়ে উভয়কে গভীরভাবে ভালবেসেছিলো।

এবার প্রদীপ শিকারে যাবার সময় মীরাকে সে সঙ্গে নেয়নি, কারণ মীরা অসুস্থ ছিলো।

মীরার কাছে প্রদীপ বিদায় নিয়ে গিয়েছিলো, হাসিমুখে তাকে বিদায় দিয়েছিলো মীরা।

কিন্তু শিকার থেকে প্রদীপ আর ফিরে আসেনি।

ফিরে এসেছে তার সঙ্গী-সাথীরা। ফিরে এসে তারা জানিয়েছে এক মহা দুঃসংবাদ।

গহন বনে যখন তারা শিকার করছিলো, তখন ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি আর তুফান শুরু হয়। সেই ঝড়-বৃষ্টি-তুফানের মধ্যে শিকারীর দল কে কোথায় ছিটকে পড়েছিলো তা কেউ জানে না।

ঝড়-বৃষ্টি-তুফান যখন থেমে গেলো তখন দেখা গেলো,দলের অনেকেই আহত হয়েছে, কারো অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হয়ে পড়েছে। কিন্তু কুমার কোথায়!

সবাই ফিরে এলো, শুধু একমাত্র ফিরে এলো না প্রদীপ।

সেদিনের পর থেকে রাজ্যময় একটা অশান্তির কালোছায়া ঘনিয়ে এলো, রাজারাণী পুত্রশোকে মূহ্যমান হয়ে পড়লেন। রাজপরিবার থেকে মুছে গেলো সব আনন্দ। প্রজাদের মনে রেখাপাত করলো রাজপরিবারের এই অশান্তির করাল ছায়া।

মন্থনা দ্বীপ একমাত্র প্রদীপকে হারিয়ে অন্ধকার হয়ে গেলো।

রাজ্যময় গভীর শোকের হাওয়া বইতে লাগলো।

মন্ত্রিকন্যা মীরা দেবী রাজকুমারের বিরহ বেদনায় আরও অসুস্থ হয়ে পড়লো, সদা-সর্বদা সে প্রদীপের জন্য অশ্রুবিসর্জন করে চললো।

মীরা দেবী পিতামাতার আদুরিনী কন্যা—তাছাড়া ভাবী রাজপুত্রবধু, তার এই করুণ অবস্থায় মন্ত্রিপরিবার মুষড়ে পড়লো। কন্যাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন মন্ত্রি চন্দ্রনাথ।

কিন্তু মীরার চোখের অশ্রু শুষ্ক হলো না, বরং আরও বেড়ে গেলো।

প্রদীপকে না পেলে তাকে বাঁচানো সম্ভব হবে না। মীরার কক্ষে ছিলো প্রদীপ ও মীরার যুগল একটি বড় ছবি। মীরার সব সময় ঐ ছবিখানার সম্মুখে দাঁড়িয়ে নীরবে রোদন করতো।

একদিন নয়, দু'দিন নয়—বেশ কিছুদিন কেটে গেলো। রাজকুমার প্রদীপের সন্ধানে যারা গিয়েছিলো সবাই বিমুখ হয়ে ফিরে এলো। মন্থনা দ্বীপের শান্তি লোপ পেলো চিরতরে।

❑

মন্থনা দ্বীপে যখন প্রদীপকুমারের নিরুদ্দেশ ব্যাপার নিয়ে মহা হুলস্থুল পড়ে গেছে তখন জাহাজ 'শাহানশাহ' এসে নোঙর করলো মন্থনা বন্দরে।

এখানে 'শাহানশাহ' দুদিন অপেক্ষা করবে। তারপর আবার রওনা দেবে বম্বাই অভিমুখে। পথে আরও কয়েকটি বন্দরে 'শাহনশাহ' নোঙর করবে বলে জানিয়েছেন ক্যাপ্টেন জমরুদী।

মিঃ জাফরী এবং পুলিশ সুপার মিঃ আহম্মদ মন্থনা দ্বীপে অবতরণ করবেন বলে জানালেন মন্থনার পুলিশ অফিসে।

খবর পেয়েই পুলিশ সুপার এলেন কান্দাই এর পুলিশ সুপারকে অভ্যর্থনা জানাতে। মন্থনার পুলিশ সুপার মিঃ মুখার্জী ও অন্যান্য পুলিশ অফিসারগণ কান্দাই এর পুলিশ অফিসারদের অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন নিজেদের অফিসে।

শহরময় একটা সাড়া পড়ে গেলো—কান্দাই পুলিশ সুপার এসেছেন মন্থনা দ্বীপ পরিদর্শনে। তাঁর সঙ্গে এসেছেন মিঃ জাফরী এবং আরও অন্যান্য পুলিশ অফিসারগণ।

মিঃ মুখার্জী 'শাহানশাহর' ক্যাপ্টেন জমরুদীকেও আমন্ত্রণ জানালেন। প্রথমে ক্যাপ্টেন জমরুদী তাঁর দাওয়াৎ কবুল করছিলেন না, পরে রাজী হলেন মিঃ জাফরীর অনুরোধে।

পুলিশ অফিস পরিদর্শনের পর মিঃ মুখার্জী পুলিশ অফিসারগণ এবং ক্যাপ্টেন জমরুদীকে নিজ বাসভবনে নিয়ে গেলেন, সেখানে তাঁদের দ্বিপ্রহর ভোজনে আপ্যায়িত করলেন।

মিঃ মুখার্জী মন্থনার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

ভোজনকালে একথা-সেকথা নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছিলো। মন্থনা দ্বীপের রাজকুমার প্রদীপের নিরুদ্দেশ ব্যাপার থেকে শুরু করে মুখার্জী তার কন্যা রীতার বিয়ের কথা পর্যন্ত তুললেন। অবশ্য মিঃ আহম্মদ তাঁর পুরানো বন্ধু লোক, তাই নিঃসঙ্কোচে কথাবার্তা চলছিলো।

মিঃ মুখার্জী কথায় কথায় তাঁর কন্যা রীতার বিয়েতে অনেক মূল্যবান একটি হার দিচ্ছেন জানালেন। হারটির মূল্য প্রায় পঞ্চাশ হাজার। আরও অনেক গহণা তিনি কন্যার জন্য তৈরী করে রেখেছেন। আগামী সপ্তাহে বিয়ে।

খাওয়া-দাওয়া পর্ব শেষ হলো, তারপর চললো দাবা খেলা। মিঃ আহম্মদ ও মিঃ মুখার্জী বহুদিন পর একত্র হয়েছেন, কাজেই তাঁরা মেতে উঠলেন আনন্দে।

জাহাজে ফিরতে রাত হয়ে গেলো।

ফিরে আর কোনো আলাপ-আলোচনা করবার মত কারো মনের অবস্থা ছিলো না। সবাই আজ বেশ পরিশ্রান্ত। গোটা মন্থনা দ্বীপ তারা আজ ঘুরে ফিরে দেখেছেন।

নিজ নিজ ক্যাবিনে প্রবেশ করে সবাই বিশ্রামের আয়োজন করতে লাগলেন।

❏

রাত বেড়ে আসছে।

'শাহানশাহ' নিস্তব্ধ। সমস্ত আরোহীরা যার যার স্থানে নিদ্রায় মগ্ন। একটা সার্চলাইট জাহাজের মাথায় আপন মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। সার্চলাইটের আলোতে আবার সমস্ত জাহাজখানায় আলোর তুলি বুনিয়ে নিয়ে ফিরে যাচ্ছে সমুদ্রের উচ্ছল ঢেউ এর বুকে।

ঠিক আলোটা যখন সমুদের বুকে গিয়ে পড়লো, জাহাজটা তখন অন্ধকারে ছেয়ে গেলো—ঐ মুহূর্তে একটা জমকালো ছায়া-মূর্তি জাহাজের পিছন ডেকের দিকে দ্রুত অগ্রসর হলো।

সার্চলাইটের আলো সমুদ্রের বুক থেকে ফিরে আসার পূর্বেই ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হলো পিছন ডেকের আড়ালে।

জাহাজের পিছনে একটা মোটা রাশি ঝুলছিলো, তার নীচেই দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি বোট।

ছায়ামূর্তি রশি বেয়ে নীচে নেমে গেলো, তারপর লাফিয়ে পড়লো বোটের উপর।

তর তর করে বোটখানা তীরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জমকালো মূর্তিটা বসে আসে, আর দু'জন কালো পোষাক পরা লোক দাঁড় বেয়ে চলেছে।

নিপুণ অভিজ্ঞ চালক ওরা।

অল্পক্ষণেই বোটখানা তীরে এসে ভিড়লো।

উঠে দাঁড়ালো ছায়ামূর্তি, চাপা গম্ভীর গলায় বললো—সাবধান, কেউ যেন তোমাদের দেখে না ফেলে। তোমরা সতর্কভাবে আশেপাশে কোথাও অপেক্ষা করো, যতক্ষণ আমি ফিরে না আসি।

লোক দু'জন মাথা নীচু করে অভিবাদন করলো।

একজন বললো—আচ্ছা সর্দার।

ছায়ামূর্তি বোটের উপর থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো তীরে।

অদূরে বন্দরের নিকটে কয়েকটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিলো। ছায়ামূর্তি প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভারখানা বের করে নিয়ে এগিয়ে গেলো। যে ট্যাক্সিখানা সর্বপ্রথম দাঁড়িয়েছিলো, সেই ট্যাক্সির পাশে এসে দাঁড়ালো। দেখলো ড্রাইভার নিশ্চিন্ত মনে নাক ডেকে পিছন আসনে ঘুমাচ্ছে।

ছায়ামূর্তি রিভলভারখানা আবার পকেটে রাখলো, তারপর রুমালটা বের করে নিয়ে উঠে পড়লো গাড়ীর মধ্যে। বলিষ্ঠ হাত দিয়ে কৌশলে ঘুমন্ত ড্রাইভারের মুখটা বেঁধে ফেললো মজবুত করে। তারপর হাত দু'খানাও বাধলো পকেটে সিল্ক-কর্ড ছিলো তাই দিয়ে। এবার ড্রাইভারের দেহটা গড়িয়ে দিলো আসনের নীচে।

ছায়ামূর্তির হাতে গাড়ীখানা উল্কাবেগে ছুটে চললো। শব্দ-হীন গাড়ীখানা—কাজেই তেমন কোনো আওয়াজ হচ্ছিলো না।

ঠিক পুলিশ সুপার মিঃ মুখার্জীর বাড়ীর পিছনে এসে থেমে পড়লো গাড়ীখানা। ছায়ামূর্তি নেমে পড়লো, অতি সতর্কতার সঙ্গে পিছন প্রাচীর টপকে প্রবেশ করলো ভিতরে।

পুলিশ সুপারের বাড়ীতে যদিও বহু পাহারাদার সদা-সর্বদা নিয়োজিত হয়েছে তবুও এদিকটায় পাহারার তেমন কোনো প্রয়োজন হয় না। সুউচ্চ প্রাচীর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

ছায়ামূর্তি সেই বিরাট উঁচু প্রাচীর অতি সহজে পার হয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো, তারপর অতি নিপুণতার সঙ্গে পিছন পাইপ বেয়ে উঠে গেলো উপরে।

কৌশলে খুলে ফেললো জানালার কাঁচের শার্শী।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলো ছায়ামূর্তি।

শয্যায় অঘোরে ঘুমাচ্ছেন মিঃ মুখার্জী। বহুদিন পর পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে বেশ আনন্দে কেটেছে সন্ধ্যা রাতটা, পরম নিশ্চিন্ত মনে এখন তিনি ঘুমাচ্ছেন।

জমকালো ছায়ামূর্তি শয্যার পাশে এগিয়ে গেলো। রিভলভারের আগা দিয়ে মিঃ মুখার্জীর গা থেকে চাদর সরিয়ে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে মুখার্জীর সুখনিদ্রা ভঙ্গ হলো, আচম্বিতে উঠে বসে তাকালেন, সম্মুখে জমকালো একটি ছায়ামূর্তি দেখে মুহূর্তে বিবর্ণ হলো তাঁর মুখমন্ডল, বললেন—কে! কে তুমি?

চাপা গম্ভীর কণ্ঠস্বর—আমি যেই হই—চাবি দাও, চাবি।

চাবি! কিসের চাবি?

সিন্দুকের চাবি।

কেন?

দাও, বেশি কথা আমি বলতে আসিনি।

মিঃ মুখার্জী বিবর্ণ ফ্যাকোশে মুখে তাকালেন ছায়ামূর্তির হস্তস্থিত উদ্যত রিভলভারের দিকে।

ছায়ামূর্তি আবার চাপা কণ্ঠে বলে উঠলো—বিলম্ব হলে মৃত্যু নিশ্চিত......

মিঃ মুখার্জী হঠাৎ এমন অবস্থায় পড়বেন কল্পনাও করতে পারেননি। এতো পাহারা পরিবেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও দস্যু কি করে প্রবেশে সক্ষম হলো। পাশেই টেবিলে ফোন, কলিং বেল রয়েছে কিন্তু হাত দেবার উপায় নেই। দস্যুর রিভলভার তাঁর বুক লক্ষ্য করে উদ্যত রয়েছে।

মিঃ মুখার্জী চাবির গোছো বালিশের তলা হতে বের করে এগিয়ে দিলেন, চোখ দুটো তাঁর আগুনের ভাটার মত জ্বলে উঠলো। তিনি কত দস্যুকে গ্রেপ্তার করেছেন আর আজ একটা দস্যুর কাছে তাঁর এতোবড় পরাজয়!

দস্যু চাবির গোছা হাতে নিয়ে বললেন—উঠুন।

সুবোধ বালকের মত উঠে দাঁড়ালেন মিঃ মুখার্জি।

দস্যু চাবির গোছা পুনরায় মিঃ মুখার্জীর হাতে দিয়ে বললো—চলুন আপনার সিন্দুকের পাশে।

মিঃ মুখার্জী বাধ্য হয়েই দস্যুর কথামত কাজ করলেন।

কন্যার বিবাহের জন্য যত গহনা তিনি তৈরি করিয়ে রেখেছিলেন সব তুলে দিলেন দস্যু-হস্তে; শুধু অলঙ্কারই নয়, যা কিছু অর্থ ছিলো বাড়ীতে—সব তুলে দিতে হলো।

দস্যু সব কিছু গ্রহণ করার পর যে পথে কক্ষে প্রবেশ করেছিলো সেই পথে বেরিয়ে গেলো।

দস্যু বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার তুলে নিলেন হাতে, ফোন করলেন পুলিশ অফিসে। কলিং বেল বাজিয়ে সবাইকে ডাকলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যে পুলিশ সুপারের বাড়ী পুলিশে ছেয়ে গেলো।

অফিস থেকে ছুটে এলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর এবং ও, সি। ঘটনা শুনে সবাই থ' খেয়ে গেলেন। কি অদ্ভুত কান্ড—পুলিশ সুপারের বাড়ীতে দস্যুতা!

চারিদিকে পুলিশ ফোর্স দস্যুর সন্ধানে ছুটলো কিন্তু কোথায় দস্যু—সব যেন হাওয়ায় মিশে গেছে।

পরদিন ঘটনাটা পত্রিকায় ছড়িয়ে পড়লো। শুধু পত্রিকাতেই নয়, লোকের মুখে মুখে নানাভাবে কথাটা বিচিত্র রূপ ধারণ করলো।

এমন সাহস কোন্ দস্যুর হতে পারে—একমাত্র দস্যু বনহুরই পারে একাজ করতে!

মন্থনা দ্বীপের অধিবাসীগণ রাজকুমারের শোকে একেই মূহ্যমান হয়ে পড়েছিলো, কারো মনে ছিলোনা কোনো শান্তি বা আনন্দ, তার মধ্যে এক ভয়াবহ ডাকাতি, মন্থনার পুলিশ সুপারের বাড়ীতে দস্যুতা। সে যে সে দস্যু নয়—স্বয়ং দস্যু বনহুর।

মন্থনার পুলিশ মহল নড়ে উঠলো, সবাই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত রইলো, কখন কোথায় আবার দস্যু বনহুর হানা দিয়ে বসবে কে জানে।

দ্বীপের অধিবাসীরা আশঙ্কায় দুরু দুরু বক্ষে কানাঘুষা করতে লাগলো। সবাই ভীত আতঙ্কিত; সন্ধ্যায় বাইরে পথেঘাটে কারো সাধ্য নেই একা সাহস করে বের হয়।

মন্থনার মহারাজ জয়কান্ত পুত্রশোক বিস্মৃত হয়ে প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থায় নিয়োজিত হলেন। দস্যু বনহুর যেন তাঁর প্রজাদের সর্বস্ব লুটে নিতে না পারে বা কাউকে হত্যা করতে না পারে।

'শাহানশাহ' বসে সংবাদ পেলেন মিঃ আহম্মদ এবং মিঃ জাফরী। সংবাদপত্রে জানাবার পূর্বেই রেডিও-সংবাদে তাঁর অবগত হলেন সব।

মিঃ আহম্মদ ও মিঃ জাফরী বিস্ময়ে আড়ষ্ট,—দস্যু বনহুর গ্রেপ্তারে তারা বন্ধাই শহরে চলেছেন, কিন্তু কি আশ্চর্য! সেই দস্যু তাদের আগমনের পূর্বেই পৌঁছে গেছে মন্থনা দ্বীপে।

মিঃ আহম্মদ বললেন—আমি ভাবতেও পারিনি, এমনভাবে দস্যু বনহুর....কথা শেষ না করেই থেমে পড়লেন। দেখলেন ক্যাপ্টেন জমরুদী ক্যাবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে। মিঃ আহম্মদের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই হাস্য উজ্জ্বল মুখে ক্যাবিনে প্রবেশ করতে করতে বললেন মিঃ জামরুদী—আপনাদের সঙ্গে সঙ্গেই সেও বিচরণ করবে।

সত্যি ক্যাপ্টেন, এ যেন কল্পনার অতীত। আমরা যাকে গ্রেপ্তারের জন্য বম্বাই চলেছি—সে আমাদের পূর্বেই এসে পড়েছে মন্থনায়।

এটা শুভ সংবাদ মিঃ আহম্মদ।

হাঁ, শুভ সংবাদই বটে। বম্বাই যাবার আর প্রয়োজন হলো না। কিন্তু বড় আফসোস দস্যু আমার বন্ধু মিঃ মুখার্জীর সব কিছু হরণ করেছে।

মিঃ জাফরী বলে উঠলেন—নরপিশাচ তাঁর কন্যার বিবাহের গহনা চুরি করে নিয়েছে। এতোটুকু মায়া-মমতা যদি থাকতো!

হাঃ হাঃ হাঃ! দস্যুর মায়া-মমতা.....অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলেন ক্যাপ্টেন জমরুদী।

মিঃ আহম্মদ ও মিঃ জাফরী অবাক হয়ে তাকালেন ক্যাপ্টেন জমরুদীর মুখের দিকে।

ক্যাপ্টেন জমরুদী বললেন—আমি আগামীকল্য জাহাজ মন্থনা দ্বীপ ত্যাগ করবার আদেশ দেবো।

মিঃ আহম্মদ বললেন—ক্যাপ্টেন, আমার অনুরোধ—আর কয়েকটা দিন আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।

সম্ভব নয় মিঃ আহম্মদ, কারণ আরোহীরা এতে বিগড়ে যাবে। তাছাড়া মন্থনায় দস্যু বনহুরের আবির্ভাব-সংবাদ প্রচার হবার সঙ্গে সঙ্গে 'শাহানশাহের' যাত্রীদের মধ্যে বেশ একটা আতঙ্ক ভাব দেখা দিয়েছে।

মিঃ জাফরী গম্ভীরভাবে কিছু চিন্তা করছিলেন, তিনি বললেন—ক্যাপ্টেন, আপনি দস্যু বনহুরের ভয়ে জাহাজ নিয়ে পালাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন, কিন্তু দস্যু বনহুর যদি আপনার জাহাজেই আপনাকে অনুসরণ করে?

মিঃ জাফরীর কথায় কক্ষমধ্যে ক্ষণিকের জন্য একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করে।

মিঃ জাফরী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ক্যাপ্টেন জমরুদীর মুখে।

ক্যাপ্টেন জমরুদীর মুখোভাব মুহূর্তের জন্য পরিবর্তন হয়, পরক্ষণেই নিজকে সামলে নিয়ে হেসে বলেন—সে কথা অবশ্য মিথ্যা নয় ইন্সপেক্টার। দস্যু বনহুরের অসাধ্য কিছু নেই, সে যে কোনো দণ্ডে যে কোনো স্থানে আগমন করতে পারে।

মিঃ জাফরীর ভ্রূ কুঞ্চিত হলো, তিনি বললেন—ঠিকই বলেছেন ক্যাপ্টেন, দস্যু বনহুরের অসাধ্য কিছু নেই, সে এই মুহূর্তে এখানেও উপস্থিত হতে পারে।

এমন সময় মিঃ মুখার্জী এবং মন্থনার কয়েকজন পুলিশ অফিসার ক্যাবিনে প্রবেশ করলেন।

মিঃ আহম্মদ এবং মিঃ জাফরী তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন। মিঃ মুখার্জীর বিবর্ণ মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যথিত হলেন তারা। এক রাত্রির ব্যবধান—মিঃ মুখার্জীর বয়স যেন আরও দশ বছর বেড়ে গেছে। চোখমুখ বসে গেছে দুশ্চিন্তায়, ললাটে ফুটে উঠেছে গভীর চিন্তারেখা।

মিঃ আহম্মদ নিজের শোফার পাশের শোফায় বসালেন মিঃ মুখার্জীকে, তিনি ঘটনাটা বিস্তারিত জানতে চাইলেন।

মিঃ জাফরী আগ্রহান্বিতভাবে তাকালেন মিঃ মুখার্জীর দিকে।

অন্যান্য অফিসারগণ নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন। ক্যাপ্টেন জমরুদী ক্যাবিন ত্যাগ করে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, মিঃ আহম্মদ তাঁকে থাকার জন্য অনুরোধ জানালেন।

জমরুদী কতকটা বাধ্য হয়েই বসলেন ওদিকের শোফায়।

মিঃ আহম্মদ জিজ্ঞসা করলেন মিঃ মুখার্জীকে—আপনি বলুন দেখি ঘটনাটা?

মিঃ মুখার্জী যতদূর সম্ভব নিজকে সংযত রেখে বললেন—আহম্মদ, আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি। দস্যু আমাকে জীবনে না মারলেও আমাকে নিঃশেষ করে দিয়ে গেছে।

সব জানতে পেরেছি মুখার্জী; সব সংবাদ পেয়েছি। এমনভাবে দস্যু সব লুটে নিয়ে যাবে—কল্পনার অতীত।

হাঁ, আমি কোনোদিন ভাবতেও পারিনি আমার বাড়ীতে দস্যু হানা দেবে। একটু থামলেন মিঃ মুখার্জী, তারপর আবার বলতে শুরু করলেন—এতো পাহারা থাকা সত্ত্বেও কি করে দস্যু আমার শয়নকক্ষে প্রবেশে সক্ষম হলো জানি না। হঠাৎ আমার নিদ্রা টুটে গেলো, আমি চোখ মেলে তাকাতেই দেখি—জমকালো পোষাক পরিহিত একটি লোক আমার সম্মুখে দন্ডায়মান; হস্তে তার উদ্যত রিভলভার।

ক্যাবিনের সকলেই স্তব্ধ হয়ে শুনছিলেন, মিঃ জাফরী সকলের অলক্ষ্যে একবার ক্যাপ্টেন জমরুদীর মুখে তাকিয়ে দেখে নিলেন।

ক্যাপ্টেন জমরুদী তখন একটি সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করছিলেন।

মিঃ মুখার্জী বলে চলেছেন—আমি ফোন বা কলিং বেলে হাত রাখতে পারলাম না। দস্যু আমার কাছে সিন্দুকের চাবি চাইলো, আমি বাধ্য হলাম তার কথা অনুযায়ী কাজ করতে। সব নিয়ে তবেই সে বিদায় নিলো।

মিঃ জাফরী বললেন—স্যার, একটা প্রশ্ন করবো আপনাকে, দয়া করে জবাব দেবেন?

হতাশা ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন মিঃ মুখার্জী মিঃ জাফরীর দিকে।

মিঃ জাফরী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—দস্যুর চেহারা নিশ্চয়ই আপনার স্মরণ আছে স্যার?

আছে।

দস্যুর দেহে জমকালো পোষাক ছিলো বলেছেন!

হাঁ, দস্যুর দেহে জমকালো পোষাক ছিলো।

মাথায় টুপী?

না, দেহের পোষাকের মতই কালো পাগ্ড়ী ছিলো।

পাগড়ীর কিছুটা অংশ......

পাগড়ীর কিছুটা কাপড় দিয়ে মুখের নীচের অংশ ঢাকা ছিলো। কিন্তু তার চোখ দুটো আমি দেখেছি, তীব্র সে চাহনি.....একটু থেমে আবার বললেন মিঃ মুখার্জী—দস্যু যে সাধারণ কোনো মানুষ নয় তা আমি বুঝতে পেরেছি....

হাঁ, আপনার অনুমান সম্পূর্ণ সত্য, দস্যু সাধারণ জন নয়।

মিঃ জাফরীর কথায় বলে উঠেন মিঃ আহম্মদ—আপনার কি মনে হয় দস্যু বনহুর মন্থনায় আগমন করেছে?

শুধু মন্থনা দ্বীপেই নয় আমাদের জাহাজেও যে তার আগমন হয়নি, তা নয়। দস্যু বনহুর আমাদের পিছু নিয়েছে।

মিঃ আহম্মদ বললেন—তাহলে আমাদের কাজ অনেক সহসা হয়ে এসেছে, দস্যু বনহুরকে আমরা মন্থনা দ্বীপেই পেয়ে গেলাম।

হাঁ, এখন কৌশলে তাকে বন্দী করা! কথাটা বলে ফিরে তাকালেন মিঃ জাফরী ক্যাপ্টেন জমরুদীর মুখে, বললেন—ক্যাপ্টেন, কারণবশতঃ আপনাকে 'শাহানশাহ' নিয়ে মন্থনায় কয়েক দিন অপেক্ষা করতে হচ্ছে। দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে আপনিও আমাদের সাহায্য করবেন আশা করি।

নিশ্চয়ই করবো, কিন্তু আমার জাহাজের যাত্রিগণ এতে মত করবে কিনা সন্দেহ।

মিঃ জাফরী বললেন—আমি সে দায়িত্বভার গ্রহণ করলাম। যাত্রিদের কাছে আমি আমাদের অসুবিধার কারণ জানিয়ে দেবো।

ধন্যবাদ, আপনি যদি এমন কোনো ব্যবস্থা করে নিতে পারেন তাহলে আমার কোনো অমত নেই।

মিঃ মুখার্জীকে যতটুকু সম্ভব সান্ত্বনা দিতে লাগলেন সবাই।

মন্থনার পুলিশ মহলে সাড়া পড়ে গেলো।

মিঃ আহম্মদ, মিঃ জাফরী দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মন্থনার পুলিশদের সাহায্যে।

মহারাজের মনে শান্তি নেই। সমস্ত মন্থনা দ্বীপের অধিবাসী রাজকুমার প্রদীপের জন্য শোকে মূহ্যমান, এমন দিনে আবির্ভাব হলো সেই দেশে দস্যু বনহুরের। মহারাজ চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

রাজসৈন্যদেরও প্রস্তুত রাখা হলো, কখন কোথায় দস্যু বনহুর আবার হানা দিয়ে বসবে কে জানে।

মন্থনাবাসীদের বুকের রক্ত পানি হতে বসেছে, দস্যু বনহুরের মন্থনায় আগমন—এ যেন মহা ভয়ানক এক দুঃসংবাদ।

মন্থনা দ্বীপ ছোট হলেও খুব ক্ষুদ্র নয়। যে কোনো একটি দেশের মতই এর পরিধি। মন্থনা দ্বীপটি দুই ভাগে বিভক্ত। মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সারথী নদী। ছোটখাট নদী নয় এটা—খুব বড় নদী। জাহাজ-ষ্টিমার, বড় বড় নৌকা সারথী নদীবক্ষে চলাচল করে থাকে।

মন্থনা বন্দর কিন্তু সারথী নদীর ঠিক বিপরীত দিকে। বন্দর ছেড়ে নদীটা প্রায় হাজার মাইল দূরে। মহারাজ জয়কান্তের রাজপ্রাসাদ এই সারথী নদীর তীরে।

মহারাজ সারথী নদীর ধারে তার সৈন্য পাহারায় নিযুক্ত করলেন। কোনো নৌকা বা ষ্টীমার বিনা অনুমতিতে যেন রাজ্যে প্রবেশ করতে না পারে।

সমস্ত মন্থনা দ্বীপে সতর্ক পাহারা মোতায়েন রইলো, দস্যু বনহুর যেন আবার কোথাও হানা দিতে না পারে।

মন্থনা দ্বীপবাসী যখন দস্যু বনহুরের ভয়ে আঁতঙ্কিত, তখন হঠাৎ একদিন ফিরে এলো প্রদীপ কুমার।

মন্ত্রি চন্দ্রনাথ তাকে মন্থনা হসপিটালে আবিষ্কার করলেন সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন অবস্থায়। মাথায় ভীষণ আঘাত পাওয়ার দরুন প্রদীপ তার স্বাভাবিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

মহারাজ জয়কান্ত খবর পেয়ে ছুটে গেলেন মন্থনা হসপিটালে। পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরে ধীরে ধীরে রোদন করলেন অনেক।

প্রদীপ পিতাকে চিনতে পারলো না।

হসপিটালের সার্জন বললেন—কুমার মাথায় ভীষণ চোট পেয়েছে, অপারেশান হয়েছে একটা—কাজেই তার স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে আসতে সময় লাগবে কিছুদিন।

মহারাজ পুত্রকে হসপিটালে রাখা আর উচিৎ মনে করলেন না, তিনি প্রদীপকে নিয়ে এলেন প্রাসাদে।

আবার মন্থনায় আনন্দের স্রোত বইলো কিন্তু স্বাভাবিক শান্তি ফিরলো না, কারণ দস্যু বনহুরের ভয়ে দ্বীপবাসী আঁতঙ্ক ভরা হৃদয় নিয়ে বসবাস করছে।

একমাত্র রাজকুমারের আগমনবার্তা সর্বত্র প্রচার করা হলো।

মীরা দেবীর মুখে আবার হাসি ফুটলো, সে অসুস্থ শরীর নিয়ে ছুটে এলো রাজপ্রাসাদে!

প্রদীপ তার নিজের ঘরে বসেছিলো মুক্ত বাতায়ন পাশে।

মীরা কক্ষে প্রবেশ করে ছুটে গেলো, উচ্ছাসিত কণ্ঠে ডেকে উঠলো সে—প্রদীপ, তুমি ফিরে এসেছো! সুকোমল বাহু দুটি দিয়ে জড়িয়ে ধরলো ওর গলা—প্রদীপ!

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো প্রদীপ মীরার মুখের দিকে।

কোনো কথা সে বললো না, বরং আশ্চর্য হলো মীরার আচরণে।

মীরা ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকলো—প্রদীপ! কথা বলছো না কেন? তবু প্রদীপ নিরুত্তর।

মীরা বার বার ডাকলো—প্রদীপ! প্রদীপ....প্রদীপ—কথা বলছো না কেন, বলো? বলো প্রদীপ?এ তুমি কি হয়ে গেছো! মীরা কেঁদে উঠলো ফুঁপিয়ে।

প্রদীপের মুখে চোখে অদ্ভুত একটি ভাব, কিছু যেন স্মরণ করতে চেষ্টা করছে—কিন্তু পারছে না যে! দক্ষিণ হস্তে নিজের চুলগুলি টেনে ধরে উবু হয়ে বসলো।

মীরা ছুটে বেরিয়ে গেলো যেমন এসেছিলো তেমনি করে।

কক্ষের বাইরেই দাঁড়িয়েছিলেন মহারাজ জয়কান্ত এবং মন্ত্রিবর। মীরা পিতার পাশে দাঁড়িয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলো—বাবা, একি হলো, প্রদীপ আমাকে চিনতে পারছে না।

সান্ত্বনা দিয়ে বললেন জয়কান্ত—মা মীরা, প্রদীপ এখন সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন। তার মাথায় ভীষণ আঘাত পাওয়ায় সে এই রকম হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন—প্রদীপের স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে আসতে কিছুদিন সময় লাগবে।

কিন্তু সে যদি আমাকে কোনোদিন চিনতে না পারে?

তোমার ভুল ধারণা মীরা, প্রদীপ কোনোদিন তোমাকে চিনতে ভুল করবে না। বললেন চন্দ্রনাথ।

আমারও তাই মনে হয়। কথাটা বললেন জয়কান্ত।

মীরার মনে তখন অশান্তির ঝড় বয়ে চলেছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো মীরা।

পুত্রকে ফিরে পেয়েও মহারাজের মনে শান্তি নেই। মহারাণী কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে পড়লেন। রাজপ্রাসাদের শান্তি ফিরে এসেও যেন আসেনি। প্রদীপকে ফিরে পেয়েও যেন কোথায় না পাওয়ার ব্যথা।

মীরা তখন বেরিয়ে গেলেও মন তার বেশিক্ষণ প্রদীপকে ছেড়ে থাকতে পারলো না।

আবার এক সময় এসে দাঁড়লো মীরা প্রদীপের পাশে।

প্রদীপ আপন মনে শুয়েছিলো বিছানায়, পদশব্দে মুখ তুলে তাকালো—কে?

মীরা। আমি তোমার মীরা।

প্রদীপ আবার বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লো।

মীরা বসলো ওর পাশে, পিঠে হাত রাখতেই চমকে উঠলো প্রদীপ।

মীরা গভীর আবেগে ডাকলো—প্রদীপ!

না না,আমি প্রদীপ নই। আমি প্রদীপ নই।

প্রদীপ, তুমি আমাকে একবার মীরা বলে ডাকো। লক্ষীটি, তোমার মুখে কতদিন আমি মীরা ডাক শুনিনি। ডাকো—একবার ডাকো মীরা বলে।

প্রদীপ ধীরে ধীরে ফিরে তাকালো, মীরার মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আবার দৃষ্টি নত করে নিলো।

মীরা উম্মুখ হৃদয় নিয়ে বললো—আমাকে চিনতে পারলে না?

প্রদীপ কোনো জবাবা দিলো না।

মীরা ওর মাথার চুলে আংগুল বুলিয়ে দিতে দিতে বললো—প্রদীপ,. শিকারে যাবার সময় তুমি আমাকে কি বলেছিলে? মনে করে দেখো দেখি? স্মরণ করো—আমার হাত ধরে বলেছিলে, মীরা তুমিই যে আমার প্রাণ, প্রাণ রেখে আমি দেহটা বয়ে নিয়ে চললাম.....উঃ সব ভুলে গেছো, সব ভুলে গেছো তুমি!

মীরা আবার উচ্ছাসিত ভাবে কেঁদে উঠে।

প্রদীপ শয্যায় উঠে বসে, বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে থাকে মীরার সুন্দর কোমল মুখের দিকে।

মীরা কেঁদে কেঁদে শান্ত হয়, তাকায় প্রদীপের দিকে, অন্তরে অতৃপ্ত বাসনা—বুকে ঝড়ের তান্ডব। প্রদীপ তাকে আজও চিনতে পারলো না।

প্রদীপ সরে যায় মীরার পাশ থেকে দূরে মুক্ত জানালার পাশে, তাকায় সীমাহীন আকাশের দিকে।

মীরা এসে দাঁড়ায়, বলে সে—প্রদীপ, চলো বাইরে যাই। হাত ধরে মীরা প্রদীপের।

প্রদীপ আপত্তি করতে পারে না। মীরার সঙ্গে বেরিয়ে যায়। সুন্দর মনোরম বাগান। নানা বর্ণের ফল-ফুলের গাছে বাগানটি ভরে রয়েছে।

মীরা আর প্রদীপ দাঁড়ায় এসে বাগানের মধ্যস্থ একটি সন্ধ্যারাগ ফুলের গাছের নীচে। সন্ধ্যারাগ ফুলের সুরভী নিয়ে সন্ধ্যার বাতাস তখন মত্ত হয়ে রয়েছে।

মীরা ডাকে—প্রদীপ!

প্রদীপ তাকায় মীরার দিকে, কোনো জবাব দেয় না।

মীরা এক থোকা সন্ধ্যারাগ তুলে নিয়ে প্রদীপের হাতে দেয়—নাও। মাথাটা এগিয়ে ধরে—গুঁজে দাও আমার খোঁপায়।

প্রদীপ চিত্রার্পিতের ন্যায় ফুলটা গুঁজে দিলো মীরার খোঁপায়।

মীরার চোখেমুখে ফুটে উঠলো একটা খুশীর উচ্ছাস। মাথা রাখলো প্রদীপের বুকে।

আকাশে চাঁদ হাসছে।

জোছনায় ভরে উঠে সমস্ত বসুন্ধরা।

সন্ধ্যারাগ ফুলের মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে বাগানের চারিদিকে।

মীরা প্রদীপের হাত ধরে বসে পড়ে ঝরনার পাশে।

জোছনার আলোতে ঝরনার পানিগুলি ঝিকমিক্ করে উঠে মুক্তবিন্দুর মত। প্রদীপ অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকে সেই দিকে।

মীরা প্রদীপের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে, প্রদীপের হাতখানা হাতের মুঠায় চেপে ধরে ডাকে—প্রদীপ!

প্রদীপের দিক থেকে কোনো সাড়া আসে না।

মীরা উঠে বসে. ব্যস্ত কণ্ঠে বলে—প্রদীপ, এমন করে আর কতদিন আমার ডাকে সাড়া না দিয়ে কাটাবে বলো? আমি যে আর সহ্য করতে পারছিনে।

প্রদীপ তেমনি নিরুত্তর।

মীরা বলে—তুমি কি পাষাণ দেবতা? এমনি করে আর কতদিন আমাকে কাঁদাবে? ওগো একবার ডাকো মীরা বলে। একবার তুমি ডাকো!

প্রদীপ অধর দংশন করে, বুকের মধ্যে যেন ঝড় বইছে ওর। মুখোভাবে ফুটে উঠে একটা অস্থিরতা, কিছু যেন স্মরণ করতে চেষ্টা করছে প্রদীপ। ঠোঁট দুখানা নড়ে উঠে ওর, কিন্তু কিছু বলে না—বলতে পারে না সে।

মীরা ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকে—প্রদীপ!

প্রদীপ অস্থিরভাবে নিজের চুলে হাত বুলায়.....না, কিছু স্মরণ হচ্ছে না ওর। কে সে? মীরাই বা কে?

অনেক করেও প্রদীপ তার সজ্ঞানে ফিরে এলো না।

মন্ত্রনার ডাক্তর কবিরাজ সব হিমসিম খেয়ে গেলো। রাজারাণী কেঁদেকেঁটে আকুল হলেন, প্রদীপ আজও তার পিতা-মাতাকে চিনতে পারলো না।

মীরা কাছে এলে প্রদীপ কেমন চমকে উঠে। মীরাকে সে কিছুতেই পূর্বের মত করে গ্রহণ করতে পারে না।

মীরাও বুদ্ধিমতি যুবতী, প্রদীপকে সে নতুন করে ফেরাতে চেষ্টা করে। প্রদীপের হৃদয় সিংহাসনে সে নিজকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

প্রদীপকে নিয়ে কখনও সে বাগানে গিয়ে বসে, হাসি-গানে মুখর করে তুলতে চায়। ফুল তুলে মালা গাঁথে, পরিয়ে দেয় প্রদীপের গলায়। কখনও সারথী নদীতে বজরা ভাসিয়ে দেয়, প্রদীপ থাকে মীরার পাশে।

মীরা তার পূর্বের কার্যকলাপ দিয়ে প্রদীপের স্মরণশক্তি ফেরাতে চেষ্টা করে।

❑

সেদিন মীরা প্রদীপসহ সারথী নদীতীরে এসে দাঁড়ালো।

সূর্যাস্তের শেষ রশ্মি তখনও পৃথিবীর বুক থেকে মিলিয়ে যায়নি। সারথী নদীর জল লাল হয়ে উঠেছে। অপূর্ব এক ভাসময় পরিবেশ। অদূরে নদীবক্ষে তাদের বজরা।

মীরা বললো—প্রদীপ, মনে পড়ে সেই আর একদিনের কথা? বজরায় উঠতে গিয়ে পা পিছলে হঠাৎ পড়ে গিয়েছিলাম আমি। তখন তুমি দিশেহারার মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে নদীবক্ষে। কত কষ্ট করে সাঁতার কেটে আমাকে তীরে উঠিয়ে নিয়ে এসেছিলে? সেদিন আমি দেখেছিলাম তোমার মধ্যে অপূর্ব এক জ্যোতির্ময় রূপ, যা আজও আমি ভুলতে পারিনি। প্রদীপ কি করে তুমি ভুলে গেলে, বিস্মৃত হলে সব? বলো—বলো প্রদীপ—মনে পড়ে কি তোমার সেই সেদিনের কথা?

মাথা নাড়ে প্রদীপ—না!

উঃ তুমি কি হয়ে গেছো? আমি যে আর সইতে পারছি না। তোমাকে ফিরে পেয়েও আমি আজ তোমাকে যেন সম্পূর্ণভাবে পাইনি। প্রদীপ, প্রদীপ জবাব দাও?

অস্ফুট কণ্ঠে প্রদীপ উচ্চারণ করে—মীরা!

মীরা প্রদীপের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, দুটি আঁখি ওর মুদে আসে, আবেগভরা কণ্ঠে বলে—প্রদীপ!

প্রদীপ নিশ্চল নিশ্চুপ।

মীরা বলে—আবার ডাকো আমাকে মীরা বলে। আমি যে তোমার মুখে মীরা ডাক শুনবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছি।

প্রদীপ আবার বলে—মীরা!

চলো প্রদীপ বজরায় যাই।

চলো।

মীরার আনন্দ আর ধরেনা, কতদিন পর আজ প্রদীপ তার নাম ধরে ডেকেছে। উচ্ছল আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠে সে।

প্রদীপের হাত ধরে বজরায় উঠে বসে।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন নববধুর মত ঘোমটা টেনে দিয়েছে।

বজরা সারথী নদীর বুক চিরে অগ্রসর হয়।

প্রদীপের বুকে হেলান দিয়ে বসে আছে মীরা দৃষ্টি তার সম্মুখস্থ জলরাশির দিকে।

মীরা বলে—প্রদীপ, সেই গানটা আজ গাওনা? যে গান তুমি গাইতে।

গান!

হাঁ সেই গান, যে গান ছিলো তোমার অতি প্রিয়।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ালো প্রদীপ—মনে নেই।

আচ্ছা, আমি গাইছি তুমি শোন। মীরা গান গায়।

তন্ময় হয়ে শোনে প্রদীপ, নির্বাক আঁখি মেলে তাকিয়ে থাকে। পূর্ব আকাশে তখন চাঁদ ভেসে উঠেছে। জ্যোছনার স্নিগ্ধ আলোতে ভরে উঠেছে নদীবক্ষ।

মীরা তার শুভ্র কোমল বাহু দুটি দিয়ে প্রদীপের কণ্ঠ বেষ্টন করে তাকায় বলে—প্রদীপ, তুমি তো এমন ছিলেনা?

মীরা লক্ষ্য করে—প্রদীপের নিঃশ্বাস দ্রুত বইছে, নিজকে যেন কিছুতেই প্রকৃতিস্থ রাখতে পারছে না, ধীরে ধীরে ওর হাত দু'খানা মীরার দেহ বেষ্টন করে ধরে ফেলে।

মীরা নিজকে এলিয়ে দেয় প্রদীপের বাহুবন্ধনে।

প্রদীপ আরও নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করে মীরাকে। মীরার হৃদয়ে অভূতপূর্ব এক অনুভূতি নাড়া দিয়ে যায়। ব্যাকুলভাবে তাকায় প্রদীপের মুখের দিকে।

প্রদীপ ওকে মুক্ত করে দেয়— না না, আমি প্রদীপ নই। আমি প্রদীপ নই------ দক্ষিণ হাতখানা দিয়ে নিজের চোখ দুটো চেপে ধরে।

মীরার মুখ মুহূর্তে ব্যথায়—বেদনায় ম্লান হয়ে উঠে, করুণ কাতর আঁখি দু'টি তুলে ধরে প্রদীপের মুখে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বজরার অদূরে দেখা যায় একখানা ছিপনৌকা তর তর করে এগিয়ে আসছে তাদের বজরার দিকে।

একজন মাঝি ছুটে আসে—দিদিমনি, একটি ছিপনৌকা এদিকে আসছে। মনে হচ্ছে কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই ছিপনৌকা খানা আসছে।

মীরা আর প্রদীপ উঠে দাঁড়ায়।

মীরা বলে উঠে—আমাদের বজরা দ্রুত চালাও।

কিন্তু মীরার কথামত বজরা দ্রুত চালিয়েও ছিপনৌকার কবল থেকে রক্ষা পেলোনা প্রদীপ আর মীরা।

ছিপ নৌকাখানা অত্যন্ত বেগে আসছিলো, অল্পক্ষণে বজরার নিকটে এসে পড়লো।

বজ্রকঠিন স্বরে ছিপনৌকা থেকে কে যেন বললো—দাঁড়াও নইলে গুলী ছুড়বো।

বজরাখানা থামাতে বাধ্য হলো মাঝিরা।

ছিপনৌকা থেকে একজন জমকালো পোষাক পরিহিত লোক লাফিয়ে নেমে পড়লো বজরার উপর। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা তার হস্তস্থিত রিভলভার উদ্যত করে ধরলো, তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—তোমাদের হাতের অস্ত্র নদীতে নিক্ষেপ করো। বিলম্ব হলে এক্ষুণি মৃত্যু ঘটবে।

বজরার পাহারাদারগণ নিজ নিজ হস্তস্থিত রাইফেল নিক্ষেপ করলো নদীবক্ষে। তারা প্রথম দর্শনেই বুঝতে পারলো দস্যু বনহুর তাদের বজরা আক্রমণ করেছে। এবার আর রক্ষা নেই তাদের। ভয়ে প্রত্যেকের হৃদকম্প শুরু হলো কে কোন্ দিকে লুকিয়ে পড়লো তার ঠিক নেই।

বজরার ছাদে বসেছিলো প্রদীপ আর মীরা, তারা বজরার সিড়ি বেয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো। মীরা ভয়াতুর কণ্ঠে বললো—প্রদীপ, আর রক্ষে নেই, দস্যু বনহুর আমাদের বজরা আক্রমণ করেছে।

প্রদীপ নিরুত্তর নীরব।

একি, তুমি অমন চুপ করে আছো কেনো, দস্যু বনহুর আমাদের বজরা আক্রমণ করেছে।

মীরা বজরার আলো নিভিয়ে দিলো।

দস্যু বনহুরের অসাধ্য কিছু নেই। বজরার মধ্যে প্রবেশ করে রিভলভার উদ্যত করে ধরলো।

মীরা প্রদীপকে আড়াল করে দাঁড়ালো নিজের প্রাণ দিয়ে সে প্রদীপকে রক্ষা করবে। দ্রুত হস্তে নিজের শরীর থেকে অলঙ্কার খুলে এগিয়ে ধরলো—নিয়ে যাও।

হাত বাড়িয়ে মীরার অলঙ্কারের স্তূপ হাতে নিলো দস্যু। তারপর বললো—শুধু অলঙ্কার নিয়েই যাবোনা সুন্দরী, তোমাকেও যেতে হবে আমার সঙ্গে।

মীরা করুণ কণ্ঠে বললো—তুমি আমাকে ক্ষমা করো। যা চাও তাই পাবে, আমাকে রেহাই দাও।

দস্যু মীরার কথায় কান না দিয়ে প্রদীপকে বেঁধে ফেললো। দ্রুত হস্তে, তারপর মীরাকে তুলে নিলো কাঁধে।

বজরারএকটি প্রাণীও টু শব্দ করবার সাহসী হলোনা।

প্রদীপকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলে রাখলো বজরার মধ্যে।

মীরা-হরণ রহস্য পরদিন মঙ্গলা দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে ভীষণ এক আতঙ্ক সৃষ্টি করলো। শুধু তাই নয় রাজকুমার প্রদীপকে দস্যু বনহুর বজরার মধ্যে মজবুত করে বেঁধে ফেলে রেখে গেছে এতোবড় সাহস তার!

একি অদ্ভুত কান্ড পর পর ঘটে চলেছে। বন্ধাই-এ গভর্ণর হাউসে হানা দিয়ে দস্যু বনহুর তাঁর সর্বস্ব লুটে নিয়ে গেছে। এমনকি তার কন্যাকেও হরণ করে নিয়ে গেছে সে। আবার মন্থনার পুলিশ সুপার মিঃ মুখার্জীর বাড়ীতে হানা দিয়ে তার কন্যা রীতার বিবাহের মূল্যবান অলঙ্কারাদি সব আত্মসাৎ করেছে। আবার প্রদীপের বজরায় আক্রমণ চালিয়ে প্রদীপকে বন্দী করে, মীরাকে নিয়ে পালিয়েছে।

পুলিশ মহল তো যারপর নাই ব্যস্ত হয়ে উঠলো। চারিদিকে এতো পাহারা থাকা সত্ত্বেও দস্যু বনহুর এই ভীষণ উপদ্রব আরম্ভ করেছে।

মন্থনাবাসীরা একরকম প্রায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলো। এতো পাহারা পরিবেষ্টিত থাকা অবস্থাতেও যখন মীরা দেবীকে বনহুর হরণ করে নিয়ে গেলো, তখন নগরবাসীদের তো কথাই নেই। কখন কার বাড়ীতে হানা পড়বে কে জানে, সুন্দরী স্ত্রী-কন্যা নিয়ে সবাই দুরু দুরু বক্ষে কাল যাপন করতে লাগলো।

❑

ক্যাপ্টেন জমরুদী জানিয়ে দিয়েছেন মন্থনায় আর বিলম্ব করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এতে শুধু জাহাজের কর্মচারীদের অসুবিধা হচ্ছেনা, সমস্ত যাত্রিগণ

ক্ষেপে উঠেছে। কাজেই অচিরে মন্থনা বন্দর ত্যাগ করতে না পারলে একটা বিভ্রাট দেখা দিতে পারে।

কিন্তু মন্থনা পুলিশ কমিশনার জাহাজ 'শাহানশাহ'কে বন্দর ত্যাগ করার অনুমতি দিলেন না। তাছাড়া অন্যান্য কোনো জাহাজ মন্থনা বন্দর ত্যাগ করতে পারবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হলো। কারণ দস্যু বনহুর যে এখন মন্থনা দ্বীপেই আছে সেটা সুনিশ্চিত। মন্থনা দ্বীপ থেকে অন্য কোনো দেশের সঙ্গে যানবাহন চলা-চলের সুযোগ ছিলোনা, সমুদ্র পথেই জাহাজ বা ষ্টীমারে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিলো না কোনো।

পুলিশ বিভাগ তাই সজাগ হলেন, কোনো জাহাজ বা জল-যান এখন মন্থনা বন্দর ত্যাগ করতে পারবে না।

ক্যাপ্টেন জমরুদী চরম অশ্বস্তি বোধ করলেন, মহা বিপদে পড়লেন তিনি। কিন্তু কোনো উপায় নেই, যতদিন দস্যু বনহুর গ্রেফতার না হয়েছে ততদিন তাকে মন্থনাতেই অপেক্ষা করতে হবে।

মিঃ আহাম্মদ এবং মিঃ জাফরী তাদের দলবল নিয়ে দস্যু বনহুরের সন্ধানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এটা কান্দাই শহর বা কোনো সমতল ভূমি পূর্ণ দেশ নয়। এটা দ্বীপ, চারিদিকে সাগর আর মাঝখানের মন্থনা দ্বীপ, কেউ গোপনে এখান থেকে পালিয়ে যাবে, তার সাধ্য নেই।

মিঃ আহম্মদ এবং মিঃ জাফরী 'শাহানশাহ' জাহাজে থেকেই তাদের দলবল নিয়ে কাজে নেমে পড়লেন। ক্যাপ্টেন জমরুদীও এ ব্যাপারে পুলিশ বিভাগকে যথাসাধ্য সাহায্য করে যেতে লাগলেন।

মন্থনা দীপে মন্ত্রিকন্যা মীরার অপহরণ নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়ে গেলো। প্রদীপকে দস্যু বেঁধে রেখে মীরাকে হরণ করে নিয়ে গেছে—এ কম কথা নয়।

মহারাজা জয়কান্ত এবং মহারাণী প্রদীপকে সুস্থ দেহে ফিরে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

❑

গভীর রাত।

গাঢ় অন্ধকারে আকাশ আচ্ছন্ন। সন্ধ্যা থেকে আকাশের অবস্থা সচ্ছ নয়। বর্ষণের পূর্বে গভীর থমথমে ভাব বিরাজ করছে। সাগরবক্ষে শুধুমাত্র জল-কল্লোলের উচ্ছ্বসিত শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ডেকের উপর খালাসীরা কম্বল মুড়ি দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। যাত্রিগণ যার যার ক্যাবিনে বা বাইরে ডেকে নিদ্রায় মগ্ন। সমস্ত 'শাহানশাহ' নীরব নিঝুম।

মিঃ জাফরী তার ক্যাবিনে বসে একখানা বই পড়ছিলেন। মিঃ আহম্মদের ক্যাবিন অন্ধকার, আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছেন তিনি।

জাহাজের আর একটি ক্যাবিনেও আলো জ্বলছিলো সেটা ক্যাপ্টেন জমরুদীর ক্যাবিন।

এক পাশে টেবিলে ল্যাম্প জ্বলছে বাইরের শার্শী দিয়ে দেখা যাচ্ছে—টেবিলের পাশে চেয়ারে বসে আছেন ক্যাপ্টেন জমরুদী। তার পিঠের দিকটাই দেখা যাচ্ছে। ক্যাপটা তার মাথায় আছে ঝুকে বসে আছেন জমরুদী। নিশ্চয়ই তিনি কিছু করছেন, টেবিলে একটা ম্যাপ খোলা।

মিঃ জাফরী হাতঘড়ির দিকে তাকালেন, রাত দুটো বিশ। বই রেখে উঠে দাঁড়ালেন, প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিলেন রিভলভারখানা ঠিক জায়গায় আছে কিনা। তারপর অতি সতর্কতার সঙ্গে বেরিয়ে এলেন ক্যাবিন থেকে। ক্যাবিনের দরজা সন্তর্পণে খুলে এগিয়ে চললেন মিঃ জাফরী।

অন্ধকারে ডেকের পাশ কেটে এগুতে লাগলেন। কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা অগ্রসর হলেন ক্যাপ্টেন জমরুদীর ক্যাবিনের দিকে। দক্ষিণ হস্তে মিঃ জাফরীর গুলীভরা রিভলভার।

জমরুদীর ক্যাবিনের পিছনে শার্শীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন মিঃ জাফরী, উঁকি দিয়ে দেখলেন—টেবিলের পাশে জমরুদী ঝুকে বসে একটা কিছু দেখছেন।

জাফরী শার্শির কাচে মৃদু আঘাত করলেন।

একবার দু'বার তিনবার —আশ্চর্য! ক্যাপ্টেন জমরুদী একটুও নড়লেন না। যেমন ঝুকে বসে কিছু দেখছিলেন তেমনি বসে রইলেন।

মিঃ জাফরী ক্যাবিনের দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করলেন। তবু ক্যাপ্টেন জমরুদী তেমনি টেবিলের পাশে বসেই রইলেন একচুল তিনি নড়লেন না।

মিঃ জাফরী সন্তর্পণে মিঃ জমরুদীর পিছন দিকে তাঁর হস্তস্থিত রিভলভারখানা চেপে ধরলেন।

কি আশ্চর্য! তবু জমরুদী নীরব।

মিঃ জাফরী বামহস্তে চেপে ধরলেন ক্যাপ্টেন জমরুদীর কাঁধটা।

সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে হতবাক হলেন, কোথায় ক্যাপ্টেন জমরুদী, একটা কাপড়ের কুন্ডলিকে কোট-টাই পরিয়ে হ্যাট মাথায় দিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে। মিঃ জাফরী স্তম্ভিত হলেন।

ঠিক্ সেই মুহূর্তে মিঃ জাফরী তার কাঁধে কারো হস্তের স্পর্শ অনুভব করলেন।

চমকে ফিরে তাকাতেই ক্যাপ্‌টেন জমরুদী একমুখ হেসে বললেন—থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ জাফরী এতো রাতে আপনি আমার কক্ষে আসবেন ভাবতে পারিনি। বসুন।

মিঃ জাফরী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—ক্যাপ্টেন, আমার সন্দেহ হয়েছিলো—আপনি---

আমি কোনো সাধারণ মানুষ নই, তাই না?

হাঁ, আপনার কার্যকলাপ আমাকে সন্দিহান করে তুলেছে। বলুন, এতো রাতে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

আপনার প্রশ্নের জবাব আজ দেবো না, দেব পরে।

জবাব আপনাকে আজই দিতে হবে ক্যাপ্টেন।

আপনি কি মনে করেন আমিই দস্যু বনহুর?

আপনাকে গ্রেপ্তার করার পর সে জবাব পাবেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন মিঃ জাফরী।

হাঃ হাঃ হাঃ! হেসে উঠলেন ক্যাপ্টেন জমরুদী—বেশ, আমাকে আপনি গ্রেপ্তার করুন।

বলুন, এতো রাতে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

আবার সেইপ্রশ্ন! যদি সঠিক জবাব না দেই?

আপনার কথাতেই আমি বুঝতে পারবো আপনার জবাব সত্য না মিথ্যা।

বেশ, তাহলে বসুন আমি বলছি।

বসতে হবে না, বলুন?

আমিও আপনার মতই দস্যু বনহুরের সন্ধানে মন্থনায় প্রবেশ করেছিলাম।

হেসে উঠলেন মিঃ জাফরী—ছেলেভুলানো কথা অন্য জায়গায় বলবেন—আসল কথা বলুন?

বেশ, আমি আসল কথা বলছি, শুনুন। ক্যাপ্টেন জমরুদী ক্যাবিনের মেঝের একস্থানে পা দিয়ে চাপ দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মেঝেটা ফাঁক হয়ে গেলো, মিঃ জাফরী পড়ে গেলেন একটা গর্তের মধ্যে। মিঃ জাফরী শুনতে পেলেন মুহূর্তের জন্য ক্যাপ্টেন জমরুদীর হাসির শব্দ।

ভোরে শয্যা ত্যাগ করে মিঃ আহম্মদ অন্যান্য দিনের মত বেড়ে টি পান করছিলেন এমন সময় পুলিশ ইনস্পেক্টার মিঃ হোসেন ব্যস্তসমস্ত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করলেন—গুড মর্নিং স্যার।

গম্ভীর গলায় মিঃ আহম্মদ উচ্চারণ করলেন—গুড মর্নিং।

মিঃ হোসেন উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন এবার—স্যার, মিঃ জাফরীকে তাঁর ক্যাবিনে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

মিঃ জাফরী! তা ব্যস্ত হবার কি আছে, নিশ্চয়ই দস্যু বনহুরের সন্ধানে মন্থনা দ্বীপে গেছেন।

না স্যার, তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ সব যেমন তেমনি আছে। নাইট ড্রেস তাঁর শরীরে ছিলো।

গম্ভীর গলায় বললেন মিঃ আহম্মদ—হুঁ। তাহলে নাইট ড্রেস পরে তিনি কোথায় গেলেন? নিশ্চয়ই জাহাজে কোথাও আছেন।

সমস্ত জাহাজ খোঁজা হয়েছে কিন্তু তিনি কোথাও নেই।

বলেন কি মিঃ হোসেন?

হাঁ স্যার।

মিঃ আহম্মদের মুখমন্ডল গম্ভীর ভাবাপন্ন হলো, তিনি তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করে বললেন—চলুন ক্যাপ্টেনকে শীঘ্র সংবাদটা দেওয়া যাক্।

ক্যাপ্টেন জমরুদী সবেমাত্র শয্যা ত্যাগ করে ডেকের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। ঠোটের ফাঁকে তার দামী চরুট। মিঃ আহম্মদকে দেখেই হেসে বললেন—গুড মর্নিং পুলিশ সুপার। তারপর খবর কি? রাতে আকাশে মেঘ থাকায় গরমটা অত্যন্ত বেশি ছিলো, কাজেই ঘুম হয়নি বুঝি?

মিঃ আহম্মদ ব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন—বড় দুঃসংবাদ ক্যাপ্টেন বড় দুঃসংবাদ।

দুঃসংবাদ!

হাঁ, মিঃ জাফরীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

হয়তো দস্যু বনহুরের সন্ধানে কোথাও ডুব মেরেছেন।

আমিও প্রথমে সেই রকম মনে করেছিলাম কিন্তু তিনি নাইট ড্রেস পরেই---

নাইট ড্রেস পরে!

হাঁ স্যার, নাইট ড্রেসটাই শুধু তাঁর ক্যাবিনে নেই, তা ছাড়া অন্যান্য জামা-কাপড়-টাই সব আছে। কথাগুলো বললেন ইনস্পেক্টর মিঃ হোসেন।

ক্যাপ্টেন জমরুদীর ললাটে চিন্তরেখা ফুটে উঠলো তিনি বললেন—নাইট ড্রেস পরে তিনি গেলেন কোথায়?

অল্পক্ষণের জন্য স্থানটায় নীরবতা বিরাজ করলো।

বললেন আবার ক্যাপ্টেন জমরুদী—পুলিশের লোক, হয়তো কোনো ছদ্মবেশে কোথাও গিয়ে থাকবেন। দেখুন অপেক্ষা করে ফিরে আসেন কিনা।

কিন্তু গোটা দিনটা চলে গেলো মিঃ জাফরী আর ফিরে এলেন না।

পুলিশ মহলে আবার নূতন এক আঁতঙ্ক দেখা দিলো।

মন্থনার আশে পাশে জলে-স্থলে-জঙ্গলে সব জায়গায় পুলিশ ছুটাছুটি করে ফিরতে লাগলো।

মিঃ আহম্মদ স্বয়ং কয়েকজন পুলিশ অফিসার সহ চষে ফিরতে লাগলেন মন্থনা দ্বীপটা—কোথায় মিঃ জাফরীকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এটাও যে দস্যু বনহুরের কাজ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর একবার মিঃ জাফরী দস্যু বনহুরের হস্তে বন্দী হয়েছিলেন, তারপর থেকে তিনিসব সময় দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছেন। কিন্তু আবার মিঃ জাফরী বন্দী হলেন দস্যু বনহুরের হস্তে।

সমস্ত পুলিশ মহল ক্ষেপে উঠলো ভীষণভাবে। দস্যু বনহুর চরম আকার ধারণ করেছে, তাকে গ্রেপ্তার না করা অবধিসাস্বস্তি নেই কারো।

শুধু মন্থনা দ্বীপেই নয়, দেশ হতে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়লো দস্যু বনহুরের এই দুর্দান্ত অভিযান-সংবাদ।

পত্রিকায় পত্রিকায় প্রকাশ পেলো, দস্যু বনহুর নবোদ্দমে আবার আত্মপ্রকাশ করেছে।

কান্দাই শহরে মনিরা এ সংবাদ পাঠ করে চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লো। মা মরিয়ম বেগমও দুশ্চিন্তায় ভেংগে পড়লেন—না জানি তার মনির কখন কোন্ বিপদে পড়বে কখন কোথায় আহত বা নিহত হবে।

মনিরা পুত্র নূরকে বুকে চেপে ধরে স্বামীর স্মৃতি স্মরণ করতে লাগলো। একমাত্র খোদার কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া কোনো উপায় রইলো না তাদের।

রহমান মাঝে মাঝে এসে সংবাদ নিতো, বেশ কিছুদিন হলো সেও আর আসে না। বড় অস্বস্তি বোধ করে মনিরা। চিরজীবন সে কেঁদে এসেছে; এখন চোখেও আর পানি আসে না। মনিরা স্বামীর জন্য সব ত্যাগ করেছে, জীবনের সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়েছে।

প্রতিদিন মনিরা স্বামীর অপেক্ষায় প্রহর গুণে, না জানি কখন এসে দাঁড়াবে তার সম্মুখে। কিন্তু দিন যায় রাত আসে, গোটা রাত বিছানায় ছটফট করে কাটায়। ঘুমন্ত নূরকে বুকে চেপে ধরে আকুল হয়ে কাঁদে। এক সময় ভোর হয়ে যায়। মনিরার অবশ চোখের পাতা মুঁদে আসে।

নূর আজকাল নিয়মিত স্কুলে যায়।

সরকার সাহেব যান তার সঙ্গে। রোজ ড্রাইভার গাড়ী করে পৌঁছে দিয়ে আসে, আবার নিয়ে আসে তাকে। পড়াশোনায় স্কুলে প্রথম স্থান দখল করে নিয়েছে নূর। তার সুন্দর চেহারায় সবাই মুগ্ধ।

স্কুল মাষ্টারগণ নূরকে অত্যন্ত স্নেহ করে, ভালবাসে।

কিন্তু স্কুলের মাষ্টারগণ জানে না—এটা করে সন্তান!

বৃদ্ধ সরকার সাহেবই নূরের অভিভাবক হিসাবে থাকেন।

নূর সরকার সাহেবকে দাদু বলে ডাকে। সর্দা-সর্বদা সরকার সাহেবের নিকটেই যত কিছু আবদার করে, কখনও কোলে, কখনও কাঁধে চেপে নানারকম প্রশ্নে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

নূরকে নিয়ে ভুলে থাকে চৌধুরী বাড়ীর লোকজন তাদের অন্তরের গোপন ব্যথা।

❑

আজ ক'দিন হলো প্রদীপ যেন একটু অন্যরকম হয়ে উঠেছে। ডাক্তার বলেছেন—আর কিছুদিনের মধ্যেই প্রদীপ তার স্বাভবিক জ্ঞান লাভ করবে।

প্রদীপ আগে ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু তাকিয়ে থাকতো কেউ কোনো প্রশ্ন করলে সহজে জবাব দিতোনা। কথা বলতো কিন্তু অত্যন্ত কম। খেতো—কিন্তু যেন তাকে জোর করে খাওয়ানো হচ্ছে।

ডাক্তারের কথায় মহারাজ জয়কান্তের মনে খুশীর বান বয়ে যায়। মহারাণী কালীমন্দিরে জোড়া বলি দেবেন মানত করেন।

শুধু শান্তি নেই মন্ত্রি চন্দ্রনাথের মনে। একমাত্র মীরাকে হারিয়ে তিনি সংসার অন্ধকারময় দেখছেন। কোনো কাজে তিনি মনোযোগ দিতে পারছেন না, অশান্তি আর বেদনায় হৃদয়টা যেন তাঁর বিষিয়ে উঠেছে।

বৃদ্ধ মন্ত্রির এই অবস্থায় রাজপরিবারেও শান্তি নেই, ভাবী পুত্রবধু মীরার অন্তর্ধানে রাজবাড়ী কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে। যেমন ফুল বিহনে বাগান অন্ধকার তেমনি। মন্ত্রিকন্যা হলেও মীরা সব সময় যেতো রাজবাড়ীতে; প্রদীপ ছাড়া মীরা এক দন্ড থাকতে পারতোনা। প্রদীপও তেমনি ভালবাসতো মীরাকে।

প্রদীপ আর মীরার প্রেমানন্দে মুখর হয়ে উঠেছিলো সমস্ত মন্থনা দ্বীপ।

হঠাৎ আলো নিভে গেলে কক্ষ যেমন অন্ধকারময় হয়ে উঠে তেমনি প্রদীপ আর মীরার জীবন আকাশের ঘনঘটা নিরানন্দে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে সমস্ত দ্বীপবাসীর অন্তর।

শুধু তাই নয়, প্রদীপ আর মীরার মধ্যে যখন একটা মহাঝঞ্ঝা বয়ে চলেছে, এমন দিনে আবির্ভাব হলো দস্যু বনহুরের। শুধু দস্যুতা করেই ক্ষান্ত হলোনা সে, হরণ করলো মন্ত্রিকন্যা মীরাকে। দুর্দান্ত দস্যুর এ অমানুষিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো মন্থনা দ্বীপবাসী। সবাই স্ত্রী-কন্যা-ভগ্নি নিয়ে আঁতঙ্কে দিন যাপন করতে লাগলো।

ঠিক্ সেই মুহূর্তে পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ জাফরীর নিরুদ্দেশ। একা মহা আশঙ্কার সৃষ্টি করলো। অহরহ পুলিশ মন্থনা দ্বীপকে আচ্ছন্ন করে রাখলো।

মন্থনার কোনো লোকের মনে শান্তি নেই। অশান্তির বহ্নিজ্বালা তাদের নিষ্পেষিত করে চলেছে। সবাই দস্যু বনহুরের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত।

❑

মীরা চোখ মেলে তাকালো, বিস্ময়ে আরষ্ট হয়ে গেলো সে। বিছানায় উঠে বসলো, সে কি স্বপ্ন দেখছে! চোখ মেলতেই মীরা দেখতে পেলো প্রদীপের ছবিখানা। এযে তার নিজের কক্ষ।

মীরা নিজের শরীর চিমটি কেটে বুঝতে পারলো সে স্বপ্ন দেখছেনা।

শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো।

পাশের মুক্ত জানালা খুলে দিতেই এক হাল্কা ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়া তার শরীরে মধুর পরশ বুলিয়ে গেলো। মীরা বুঝতে পারলো, ভোর হয়েছে।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো, তখনও বাড়ীর কেউ জেগে উঠেনি। মীরা আনন্দে উচ্ছল হয়ে ছুটে গেলো, পিতা মাতার বন্ধ দরজায় আঘাত করে ডাকালো—বাবা, বাবা, মা, মাগো---মা, মা আমি এসেছি----

কন্যার কণ্ঠস্বর কানে যেতেই ধড়মড় করে শয্যায় উঠে বসেন মন্ত্রি চন্দ্রনাথ, স্ত্রীকে ডেকে বলেন—কে ডাকে দেখোতো! ঠিক মীরার গলা বলে মনে হচ্ছে যে?

মীরা! আমার মীরা ফিরে এসেছে! তাড়াতাড়ি মন্ত্রিপত্নী লতারাণী দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বাইরে। কন্যাকে সুস্থ দেহে সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকেন—মীরা!

মীরা ঝাপিয়ে পড়ে মায়ের বুকে—মা, মাগো।

ততক্ষণে মন্ত্রি চন্দ্রনাথ এসে দাঁড়িয়েছেন কন্যা এবং স্ত্রীর পাশে।

মন্ত্রি চন্দ্রনাথ বলেন—মীরা কি করে ফিরে এলি মা?

বাবা, সব বলছি, চলো।

চল্ মা, চল্ কিন্তু দস্যু তোকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো, প্রদীপকি আর তোকে ফিরে নেবে?

বাবা, তোমরা শুনে আশ্চর্য হবে, দস্যু আমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলো সত্য, কিন্তু আমাকে সে স্পর্শ করেনি বাবা। দস্যু হলেও তার

মত মহৎ আমি দেখিনি। তুমি বিশ্বাস করো বাবা, আমি সেখানে এতটুকু কষ্ট পাইনি। আমাকে সেখানে রাজকন্যার মত রাখা হয়েছিলো।

তাহলে তোকে চুরি করে নিয়ে যাবার কারণ কি ছিলো দস্যুর?

জানিনে বাবা। কিন্তু এইটুকুই জানি, দস্যু অতি মহৎ প্রাণ। আমার যে অলঙ্কারগুলি নিয়েছিলো সব ফেরৎ দিয়েছে।

সত্য বলছিস মীরা? বললেন লতা দেবী।

মীরা তার শরীরের দিকে তাকিয়ে সব অলঙ্কার দেখালো।

মন্ত্রি চন্দ্রনাথের চোখে মুখে বিস্ময়!

লতাদেবীর খুশিতে মুখমন্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বললেন তিনি—মা মীরা তোকে ফিরে পাবো সে আশা আমার ছিলোনা। আমি অবাক হচ্ছি দস্যু তোর গহনাগুলো কেড়ে নেয়নি।

মা, আমিও প্রথম ভেবেছিলাম দস্যু আমার উপর না জানি কত উপদ্রব করবে কিন্তু--কিন্তু আমাকে সে বোনের মত দেখেছে।

সব ঘটনা খুলে বল্ মা, আমি যে সব শুনতে চাই? বললেন চন্দ্রনাথ।

মীরা পিতামাতা সহ কক্ষে গিয়ে বসলো।

মীরা বললো—বাবা, প্রদীপকে বেঁধে রেখে দস্যু যখন আমাকে কাঁধে উঠিয়ে নিলো তখন আমি হাত-পা ছুঁড়ে নিজকে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু দস্যুর বলিষ্ঠ বাহু থেকে আমি মুক্তি পেলাম না।

মীরা বলে চললো মন্ত্রি এবং মন্ত্রিপত্নী সব মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগলেন।

মীরা বলে চলেছে—একটা ছিপনৌকায় আমাকে নামিয়ে রেখে দস্যু গম্ভীর গলায় বললো, খবরদার নড়বে না, নড়লেই পড়ে যাবে নদীতে। আমি তোমাকে কিছু বলবোনা, তুমি চুপ করে বসে থাকো। আমি দস্যুর কথায় চোখ তুলে তাকালাম দেখলাম লোকটার শরীরে কালো পরিচ্ছদ মুখে কালো মুখোস—কিছু দেখা যাচ্ছে না। কেমন দেখতে লোকটা তাও দেখতে পেলাম না। কিন্তু আমি আশ্বস্ত হলাম তার কথায়। নদীতে ঝাপিয়ে না পড়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম তার পরবর্তী কার্যের জন্য। কিন্তু আমি অবাক হলাম একটা মিষ্টি গন্ধ আমার নাকে লাগলো ঠিক কোনো অজানা ফুলের সুরভীর মত।

তারপর? বললেন চন্দ্রনাথ।

তারপর আমি ধীরে ধীরে নৌকাখানার উপরে ঢলে পড়লাম আর মনে নেই।

মীরা, দস্যু তোকে অজ্ঞান করেছিলো?

হাঁ মা, তারপর যখন জ্ঞান হলো চেয়ে দেখি—সুন্দর সুসজ্জিত একটি কক্ষে সজ্জিত বিছানায় শুয়ে আছি। বিছানায় উঠে বসতেই একটি বৃদ্ধলোক আমাকে দুধ আর ফলমূল খেতে দিলো। আমি অবাক কণ্ঠে বললাম, এখন আমি কোথায়? বৃদ্ধলোকটি বললো, তুমি ভাল জায়গায় আছো এ সব খেয়ে বিশ্রাম করো। আমি কাঁদাকাটা শুরু করলাম, যখন কিছু মুখে দিলাম না, তখন এক সময় সেই লোকটি এলো, যার মুখমণ্ডল আমি কোনো সময় দেখতে পাইনি। কালো আবরণে তার মুখ ঢাকা ছিলো। সে বললো, তোমাকে আমি কিছুদিন এখানে আটকে রাখবো তারপর আবার তুমি ফিরে যাবে তোমার প্রিয় রাজকুমারের পাশে। আমি তার কথা বিশ্বাস করিনি, কিন্তু আজ বুঝতে পারছি, সে যা বলেছে সব সত্য।

তোকে সে নিজেই রেখে গেছে?

না মা, আমি রাতে আমার সেই কক্ষে ঘুমিয়েছিলাম। ভোরে জেগে দেখি আমি এখানে---

চন্দ্রনাথ বিজ্ঞেরমত মাথা দুলিয়ে বললেন—দস্যু বনহুর ছাড়া এটা অন্য কারো কাজ নয়। শুনেছি দস্যু বনহুর নাকি শুধু মহৎই নয় তার অন্তর অত্যন্ত উঁচু।

মা, প্রদীপ কেমন আছে?

আগের চেয়ে অনেকটা সুস্থ হয়েছে সে।

আমি তার সঙ্গে দেখা করে আসি।

যাও মা, যাও---বললেন চন্দ্রনাথ।

মীরা ছুটে গেলো চঞ্চল হরিণীর মত।

প্রাতঃভ্রমণ করছিলো প্রদীপ তাদের বাগানের মধ্যে। পায়চারী করছিলো আর গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছিলো।

মীরা ছুটে এলো, প্রদীপকে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার বুকে—প্রদীপ!

প্রদীপ নীরব, পাথরের মূর্তির মত স্থির।

মীরা ব্যাকুল কণ্ঠে বললো—প্রদীপ, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছোনা? কথা বলো, কথা বলো প্রদীপ?

প্রদীপ তবুও নিরুত্তর।

মীরা প্রদীপের জামার আস্তিন ধরে ঝাঁকুনি দেয়—কথা বলছোনা কেনো? তুমি কোনেদিন আমাকে অবিশ্বাস করবে না, করতে পারবেনা। প্রদীপ, আমি যে তোমার—তোমারই আছি।

মীরা।

বলো? বলো কি বলতে চাও?

আমি কে মীরা?

একি কথা বলছো প্রদীপ? তুমি আমার প্রদীপ।

না না মীরা, আমি প্রদীপ নই। আমি প্রদীপ নই---

চুপ করো, চুপ করো প্রদীপ। আশ্চর্য তুমি মানুষ। কতদিন পর ফিরে এলাম অথচ তুমি আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করলে না। দস্যু আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে আমি কেমন ছিলাম তাও তুমি জানতে চাইলে না? প্রদীপ এ ক'দিন আমি শুধু তোকেই ধ্যান করেছি, তোমার ঐ মুখকানা আমি মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারিনি। প্রদীপ, চলো প্রাসাদে যাই, তোমার বাবা মা আমাকে সচ্ছ মনে গ্রহণ করবেন কিনা জানিনে। যদি তারা আমাকে সন্দেহ করে তাহলে কি হবে প্রদীপ?

আমি তো তোমাকে গ্রহণ করেছি মীরা।

প্রদীপের কথায় মীরার চোখদুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে, বলে সে—ইস্ আজ আমার কি আনন্দ! কি আনন্দ প্রদীপ! কেমন করে তোমাকে বোঝাবো! মীরা প্রদীপের বুকে মাথা রাখে।

প্রদীপ ওকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করতে যায় সঙ্গে সঙ্গে মীরাকে মুক্ত করে দিয়ে বলে— না না মীরা, তুমি যাও। তুমি যাও মীরা।

কেনো তুমি অমন করছো?

প্রদীপ দক্ষিণ হাতের আংগুলে নিজের মাথার চুল ছিড়তে থাকে, অধর দংশন করে বার বার।

মীরা লক্ষ্য করলো, প্রদীপের মুখমন্ডল কেমন যেন বিবর্ণ লাগছে।

মীরা বললো—প্রদীপ, তুমি কি অসুস্থ বোধ করছো?

হাঁ, আমি বড় অসুস্থ বোধ করছি। মীরা আমাকে একা থাকতে দাও। আমাকে একা থাকতে দাও---

প্রদীপ!

প্রদীপ তখন বসে পড়েছে বাগানস্থ পাথরাসনে।

মীরা বসে ওর চুলে-পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। মীরার মুখেও দুশ্চিন্তার ছাপ ভেসে উঠেছে।

যে প্রদীপ তার সঙ্গ ছাড়া একমুহূর্ত বাঁচতো না, আজ সেই প্রদীপ তাকেচলে যাবার জন্য বলতে পারছে! মীরার অন্তরে একটা ব্যাথার খোঁচা লাগে। কিন্তু সে প্রদীপের কথা মত চলে গেলো না; মীরা জানে প্রদীপ মাথায় আঘাত পাওয়ার দরুণ তার স্মৃতি বিস্মৃতি ঘটেছে। মীরা আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো, প্রদীপের পিঠে মাথা রেখে বললো—প্রদীপ, তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারবে না। আমি যে তোমার। তুমি ছাড়া মীরা বাঁচতে পারে না।

প্রদীপ কোনো জবাব দেয়না, ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় মীরার দিকে।

মীরা এগিয়ে আসে প্রদীপের পাশে, মুখটা তুলে ধরে তার চোখের সম্মুখে, বলে মীরা—অমন করে আমার মুখে তাকিয়ে কি দেখছো প্রদীপ?

কিছু না মীরা। কিছু না!

প্রদীপ, তুমি যেন আগের সেই প্রদীপ নেই, কেমন যেন হয়ে গেছো। কোনোদিন কি তুমি আমাকে আগের মত করে বুকে টেনে নিতে পারবে না? সেই আবেগ -মধুর কণ্ঠে ডাকতে পারবে না মীরা বলে! কেন কেন তুমি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছো?

জানি না।

প্রদীপ, ডাক্তার বলেছিলো তোমার স্মৃতি বিস্মৃতি ঘটেছে।

হয়তো তাই হবে।

আগের কথা তুমি স্মরণ করতে চেষ্টা করো?

পারছি না। পারছি না কোনো কথা স্মরণ করতে।

আমি কে আমাকে তুমি আজও চিনতে পারোনি?

না।

উঃ! মীরা দু'হাতে বুক চেপে ধরলো, তারপর ছুটে চলে গেলো সেখান থেকে!

প্রদীপ মীরার অদ্ভুত আচরণে আশ্চর্য হলোনা। ওর চলে যাওয়া পাথর দিকে তাকিয়ে কি যেন গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলো।

❑

মিঃ আহম্মদ কয়েকজন পুলিশ অফিসার ও সশস্ত্র পুলিশ মন্থনা গিয়ে দ্বীপের আশে পাশে পাহাড়ে-জঙ্গলে সন্ধান করে চললেন।

গহন জঙ্গল।

দ্বীপের মধ্যে একজন একটা জঙ্গল থাকতে পারে—প্রথমে ভাবতেই পারেনি মিঃ আহম্মদ। তিনি দলবল নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। জঙ্গলের এদিকটা মানুষ প্রবেশে সক্ষম নয়। তবু অনেক কষ্টে মিঃ আহম্মদ চলেছেন সাথীদের নিয়ে।

এ জঙ্গলটা মন্থনার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। বড় বড় শাল আর সেগুন গাছে জঙ্গলটা ঘন হয়ে উঠেছে। বন্য জীবজন্তুর অভাব নেই। সাবধানে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছেন মিঃ আহম্মদ তাঁর দলবল নিয়ে।

একটা ব্যাপারে আহম্মদ সাহেব আজ অনেকটা আশ্বস্ত হতে পেরেছেন গত কয়েকদিন পূর্বে মন্ত্রিকন্যা মীরা ফিরে এসেছে। মীরার জবানবন্দীতে জানতে পেরেছেন—দস্যু তাকে হরণ করে নিয়ে গেলেও সে তার উপর কোনোরকম খারাপ আচরণ করেনি। মীরার মুখে আরও জেনেছেন—দস্যুর যে বর্ণনা সে দিয়েছে তাতে বোঝা যায়, দস্যু বনহুরেরই এ কাজ। তাতে মিঃ আহম্মদ বদ্ধপরিকর হয়েছেন, মন্থনায় বসে দস্যু বনহুর তার কার্য সমাধা করে চলেছে; এবং মিঃ জাফরীকেও সে-ই বন্দী করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মিঃ আহম্মদ বিপুল বিক্রমে তাই ঝাপিয়ে পড়েছেন মিঃ মুখার্জী মন্থনার পুলিশ বাহিনী নিয়ে তাঁকে সর্বান্তকরণে সাহায্য করে চলেছেন। এটা তাঁরও কর্তব্য।

আজ মন্থনা দ্বীপের শেষ প্রান্তে তাঁরা এসে পৌঁছেছেন, মন্থনা শহর ছেড়ে প্রায় একশত মাইল দূরে এ জঙ্গল।

মিঃ জাফরী এবং মিঃ মুখার্জী তাদের পুলিশ বাহিনী নিয়ে জঙ্গলটা চষে বেড়াচ্ছেন তাঁদের ধারনা—এ জঙ্গলেই কোথাও দস্যু বনহুর তার আস্তানা গেড়েছে।

সমস্ত বনে সন্ধান চালাতে পুরো তিন দিন কেটে গেলো। পুলিশ অফিসার গণ কেউ কেউ বাঘ এবং হরিণ শিকার করলেন। মস্ত বড় একটা অজগর সাপ শিকার করলেন মিঃ আহম্মদ তৃতীয় দিনে!

অজগর সাপটা মারলেন তাঁরা জঙ্গলের উত্তর-দক্ষিণ অঞ্চলের শেষ প্রান্তে। বিরাট অজগর, একটা গাছের গুড়ির মত গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছিলো, হয়তো বা শিকারের সন্ধানে সর্পরাজ চলেছিলেন মন্থর গমনে।

অজগর সাপটাকে নিহত করার পর পুলিশ বাহিনী সাপটাকে ঘিরে ধরে দেখছিলেন এমন সময় হঠাৎ একজনের দৃষ্টি চলে গেলো দূরে অনেক দূরে একটা নদীর তীরে। ঝোপ-জঙ্গলের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে—একটি জমকালো পোষাক-পরা লোক নদী-তীরে এগিয়ে যাচ্ছে। পিঠের সঙ্গে লোকটার রাইফেল বা বন্দুক জাতীয় কিছু বাঁধা রয়েছে। লোকটি দৃষ্টি আকর্ষণ করলো মিঃ আহম্মদের।

মিঃ আহম্মদ দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা বের করে চোখে লাগিয়ে দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চাপা কণ্ঠে বললেন—পেয়েছি, আমরা যাকে সন্ধান করে ফিরছি সেই দুর্দান্ত দস্যু বনহুর। দূরবীক্ষণে চোখ লাগিয়ে স্পষ্ট দেখলেন—জমকালো পোষাক-পরা মাথায় পাগড়ী লোকটা নদীর ধরে হাটু গেড়ে বসে দু'হাতে পানি পান করছে।

মিঃ আহম্মদ ইংগিৎ করলেন সমস্ত পুলিশ বাহিনীকে প্রস্তুত হয়ে নিতে। তাঁর চোখ দুটো আগুনের গোলার মত জ্বলজ্বল করে জ্বলছে যেন।

মুহূর্তে সমস্ত পুলিশ বাহিনী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরী হয়ে পড়লো। তারপর দ্রুত অগ্রসর হলো ঝোপঝাড় আর জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে।

মিঃ আহম্মদ দলবল নিয়ে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলো তাদের নির্দিষ্ট স্থানে।

নদীতীরে পানি পান করে একটা বৃক্ষতলে এসে কেবল-মাত্র বসেছে দস্যু বনহুর।

চারিদিক থেকে অস্ত্র উদ্যত করে পুলিশ বাহিনী তাকে ঘিরে ধরলো। মিঃ আহম্মদ কঠিন বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বললেন—খবরদার নড়োনা। এক চুল নড়লেই মরবে।

মিঃ আহম্মদের রিভলভার দস্যু বনহুরের বুক লক্ষ্য করে উদ্যত রয়েছে—চারিদিকে অসংখ্য রাইফেল আর পিস্তল।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো হঠাৎ এভাবে আক্রমণের জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিলোনা।

মিঃ আহম্মদ তাঁর দলবলকে ইংগিৎ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে মিঃ মুখার্জী স্বহস্তে দস্যু বনহুর হস্তে হাত কড়া পরিয়ে দিলেন। দস্যু বনহুরকে একটি শব্দও উচ্চারণ করবার সময় না দিয়ে তাকে মজবুত করে বেঁধে ফেলা হলো।

❑

দস্যু বনহুর বন্দী হওয়ায় মন্থনা দ্বীপে এক মহা আনন্দ স্রোত বয়ে চললো। নগরের সৌধচূড়ায় বড় বড় অক্ষরে লেখা "দস্যু বনহুরের কবল থেকে মন্থনা দ্বীপের মুক্তি"।

আবার মন্থনায় ফিরে এলো স্বাভাবিক স্বস্তি। দ্বীপবাসী নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো এবার।

বহুদিন ধরে যে সব জলযান মন্থনা বন্দরে অবস্থান করছিলো সবগুলিকে চলাচলের অনুমতি দেওয়া হলো।

'শাহানশাহ' জাহাজ ঘটা করে মন্থনা বন্দর ত্যাগ করলো। মিঃ আহম্মদ এবং অন্যান্য পুলিশ বাহিনী দস্যু বনহুরকে বন্দী করে জাহাজ 'রকেটে' কান্দাই অভিমুখে রওয়ানা দিলো।

'রকেট' অতি দ্রুতগামী মজবুত জাহাজ। দস্যু বনহুরের জন্য এই জাহাজেরই প্রয়োজন।

মিঃ আহম্মদ পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ জাফরীর জন্য অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করলেন, কিন্তু তিনি আর মন্থনায় বিলম্ব করতে পারলেন না। দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করেছেন, সে এখন তাদের হাতে বন্দী, এ অবস্থায় আর দেরী করা উচিৎ নয়। কান্দাই-এ হাঙ্গেরী কারাগার ছাড়া বনহুরকে আটকে রাখার মত আর কেনো কারাগার ছিলো না।

কিন্তু মিঃ আহম্মদ যে মুহূর্তে মন্থনা দ্বীপ ত্যাগ করবেন ঠিক সেই মুহূর্তে কান্দাই থেকে মিঃ আহম্মদের নিকটে তারাবার্তা এলো। আশ্চর্য হলেন তিনি তারবার্তা পেয়ে। কান্দাই থেকে মিঃ জাফরী তাঁকে এ তার পাঠিয়েছেন, জাহাজ 'শাহান শাহ'কে আটক করার জন্য তিনি জানিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন জমরুদীকে যেন বন্দী করা হয়।

মিঃ আহম্মদ যখন কান্দাই থেকে মিঃ জাফরীর তারবার্তা পেলেন তখন 'শাহনশাহ' মাঝ দরিয়ায়।

মিঃ আহম্মদ তারবার্তা সম্বন্ধে মিঃ মুখার্জীকে সব খুলে বলেন, এবং একখানা ষ্টীমার নিয়ে 'শাহানশাহ'কে ফলো করবার জন্য নির্দেশ দিলেন। আরও জানালেন 'শাহনশাহে'র ক্যাপ্টেন জমরুদীকে যেন বন্দী করা হয়। তিনি নিজেই 'শাহনশাহ'কে অনুসরণ করতেন, কিন্তু দস্যু বনহুরকে বন্দী করতে পেরেছেন এটাই তাঁর সৌভাগ্য, বিশেষ করে দস্যুকে নিয়ে মন্থনায় আর একটি দিনও অপেক্ষা করা ঠিক হবে না।

মিঃ আহম্মদ 'রকেটে' দস্যু বনহুরকে বন্দী করে নিয়ে কান্দাই-এর পথে রওয়ানা দিলেন।

দস্যু বনহুরকে বন্দী করা কম কথা নয়, সেই দস্যুকে বন্দী করে নিয়ে ফিরে চলেছেন মিঃ আহম্মদ তাঁর দলবল নিয়ে। মজবুত লৌহশিকলে বনহুরের দেহ শৃঙ্খলাবদ্ধ। এবার আহম্মদ সাহেব ভুল করেননি, পা এবং হাত লৌহশিকলে আবদ্ধ করেছেন যেন কোনোরকমে পালাতে সক্ষম না হয়।

'রকেটে'র একটি সুদৃঢ় ক্যাবিনে তাকে আটক করে রাখা হয়েছে। ক্যাবিনের দরজার আশে পাশে সশস্ত্র পুলিশ সদা দন্ডায়মান। এবার যেন কোনো রকম সুযোগ না পায় যে ফাঁকে সে পালাতে পারে।

মিঃ আহম্মদের মনে আনন্দ—এবার তাঁর যাত্রা সাফল্য মন্ডিত হলো। নিজে তিনি দস্যুসম্রাট বনহুরকে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছেন।

পৌঁছানোর পূর্বেই মিঃ আহম্মদ কান্দাই পুলিশ অফিসে খবর পাঠিয়েছেন, দস্যু বনহুরকে নিয়ে তিনি কান্দাই অভিমুখে রওয়ানা দিয়েছেন।

দস্যু বনহুর সহ 'রকেট' তার গন্তব্যস্থান কান্দাই বন্দরে পৌঁছে গেলো।

মিঃ আহম্মদ যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। দস্যু বনহুরকে নিয়ে তিনি ভালোয় ভালোয় কান্দাই এসে পৌঁছতে পেরেছেন।

বন্দরে অবতরণ করতেই দেখলেন মিঃ আহম্মদ—মিঃ জাফরী অসংখ্য পুলিশ ফোর্স নিয়ে বন্দরে অপেক্ষা করছেন। মিঃ আহম্মদ জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে আনন্দের আতিশয্যে। কেমন করে তিনি কান্দাই এলেন এবং কি ব্যাপার সব জানতে চাইলেন।

মিঃ জাফরী নিজের কথা বলার পূর্বে ব্যস্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন 'শাহনশাহ' জাহাজটিকে আটক করা হয়েছে কিনা এবং ক্যাপ্টেন জমরুদীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা।

মিঃ আহম্মদ জানালেন, কান্দাই থেকো তারবার্তা পাওয়ার পূর্বেই 'শাহানশাহ' মন্থনা বন্দর ত্যাগ করেছিলো, কাজেই মিঃ জাফরীর কথামত কাজ করতে সক্ষম হয়নি তারা। মন্থনার পুলিশ বাহিনী ষ্টিমার যোগে 'শাহনশাহ'কে অনুসরণ করেছেন। মিঃ মুখার্জী স্বয়ং এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, নিশ্চয়ই সফলকাম হবেন।

মিঃ জাফরী এ ব্যাপারে কতখানি আশ্বস্ত হলেন তিনিই জানেন। মিঃ জাফরীর মনে একটা সন্দেহ দোলা দিচ্ছিলো, ক্যাপ্টেন জমরুদী যে স্বাভাবিক কোনো মানুষ নয়, সেই যে দস্যু বনহুর—এমনি একটা ধারনা তাঁর মনে সুদৃঢ় হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু যখন মিঃ আহম্মদ দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এলেন, অথচ 'শাহানশাহ'তে ক্যাপ্টেন জমরুদী বন্ধাই অভিমুখে চলেছে জানতে পারলেন তখন তিনি একটু চিন্তায় পড়লেন—তবে ক্যাপ্টেন জমরুদী লোকটা কে?

মিঃ আহম্মদকে তিনি সংক্ষেপে বললেন তাঁর বন্দী হবার কাহিনী। 'শাহানশাহে'র একটি চোরা কুঠরীতে তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো। এবং সেখানেই তিনি বেশ কিছুদিন বন্দী অবস্থায় ছিলেন, তাঁর উপর কোনো রকম অত্যাচার বা উৎপীড়ন করা হয়নি।

মিঃ জাফরীর কথা শুনে মিঃ আহম্মদ অবাক হলেন, তাঁরা যে জাহাজে ছিলেন সেই জাহাজেই বন্দী ছিলেন মিঃ জাফরী—এ যেন তাদের কল্পনার অতীত।

মিঃ জাফরী আরও বললেন—একদিন আমি নিদ্রাভঙ্গের পর হঠাৎ চোখ মেলে দেখি, আমি কান্দাই-এ আমার কক্ষে ঘুমিয়ে আছি। আশ্চর্য, আমাকে শয়তান কিভাবে ঘুম পাড়িয়ে সুদূর মন্থনা দ্বীপ হতে কান্দাই নিয়ে এসেছিলো, এতটুকু আমি জানতে পারিনি। কিন্তু আমি সন্দেহ

করেছিলাম—ক্যাপ্টেন জমরুদীই দস্যু বনহুর। তাঁর কার্যকলাপে সেই রকম আমার মনে হয়েছিলো। এখন দেখছি জমরুদী পৃথক জন।

কিন্তু মিঃ জাফরীর সন্দেহ সত্যে পরিণত হলো দস্যু বনহুরকে কারাগারে বন্দী করার পর।

মিঃ মুখার্জী তার পাঠিয়েছেন, 'শাহানশাহ' জাহাজটিকে আটক করতে সক্ষম হয়েছি, কিন্তু আশ্চর্য! ক্যাপ্টেন জমরুদী উধাও হয়েছে! জাহাজের দ্বিতীয় ক্যাপ্টেন লোহানী জানিয়েছেন তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় মন্থনা দ্বীপেই রয়ে গেছেন।

মিঃ জাফরী মিঃ মুখার্জীর তারবার্তা পেয়ে বুঝতে পারলেন দস্যু বনহুরই ক্যাপ্টেন জমরুদী এবং জমরুদীই দস্যু বনহুর। দস্যু বনহুর গ্রেপ্তারের মাধ্যমেই লুকানো রয়েছে জমরুদীর অন্তর্ধান।

সমস্ত কান্দাই শহরে দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার বাণী বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়লো। রেডিও ঘোষণা করলো, পত্রিকায় প্রকাশ পেলো, টেলিভিশনে জানানো হলো—দস্যু বনহুর মন্থনা দ্বীপের অদূরে ঝাঁম জঙ্গলে গ্রেপ্তার হয়েছে।

মনিরা সংবাদ শোনামাত্র অস্থির হয়ে পড়লো।

মরিয়ম বেগম নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। জায়নামাজে খোদার কাছে মোনাজাত করতে শুরু করলেন। তিনি ছাড়া আর কিইবা উপায় আছে তার?

সরকার সাহেবও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন, তাঁর মনেও অশান্তির ঝড় উঠলো।

❑

সংবাদটা বনহুরের আস্তানাতেও পৌঁছে গেলো। বনহুরের অনুচরগণ এতোদিন জানতো—তাদের সর্দার দূরে কোথাও আত্মগোপন করে তার কাজ করে যাচ্ছে, তবু সান্ত্বনা ছিলো সকলের মনে। হঠাৎ সর্দারের গ্রেপ্তারবাণী শুনে মুষড়ে পড়লো সবাই।

রহমান ছিলো—সেও ডুব মেরেছে কোথায় কে জানে! সর্দারের নিরুদ্দেশের পর রহমানও একদিন কোথায় চলে গেছে কাউকে কিছু না জানিয়ে।

উপস্থিত আস্তানার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলো কায়েস। আর নাসরিন যোগাতো তাতে উৎসাহ।

বনহুরের অনুচরগণ ছিলো অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ। বনহুর এদের তৈরী করে নিয়েছিলো নিজ মনের মত করে। যেমন দূর্দান্ত সাহসী ছিলো ওরা তেমনি ছিলো নিষ্ঠাবান। সর্দারের বিনা অনুমতিতে তারা সামান্য কোনো দস্যুতাও কখনও করতো না। সর্দারের অভাবে তারা বাধ্য হতো রহমানের আদেশ পালন করতে।

সর্দার নেই, রহমান নেই, কাজেই অনুচরগণ সবাই নীরবে দিন যাপন করছিলো। তাই বলে কেউ বসে থাকতো না, যার যা কাজ করে যেতো মনোযোগ সহকারে। সর্দার ফিরে এলে তাদের ত্রুটি যেন ধরতে না পারে।

হঠাৎ এমন দিনে সর্দারের গ্রেপ্তার-সংবাদ আস্তানার সবাইকে ভাবিয়ে তুললো। সমস্ত অনুচরগণ একত্রিত হয়ে যুক্তি-পরামর্শ করে চললো। নাসরিনও যোগ দিলো সকলের সঙ্গে।

সেদিন দরবার কক্ষে দস্যু বনহুরের অনুচরদের মধ্যে একটা আলোচনা সভা বসেছিলো।

কয়েস সর্দারের সুউচ্চ আসনের পাশে দাঁড়িয়ে বলছিলো—ভাইসব, আজ যে সংবাদ আমরা শুনলাম তাতে আমাদের মুষড়ে পড়ার কিছু নেই। আমরা জানি, আমাদের সর্দারকে কোনো কারাগার আটকে রাখতে সক্ষম হবে না। তবু আমাদের উপায় খুঁজতে হবে—কিভাবে আমরা তাকে মুক্ত করে আনতে পারি বা পারব। সব চেয়ে বড় আফসোস—আজ রহমান ভাই নেই, সে থাকলে এ ব্যাপারে আমরা তার কাছে যথেষ্ট পরামর্শ পেতাম....

কয়েসের কথা শেষ হয় না, রহমান কক্ষে প্রবেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের সমস্ত অনুচর আনন্দধবনি করে উঠে। কায়েস উচ্চস্থান হতে নেমে এসে রহমানকে কুর্ণিশ করে দাঁড়ায়, বলে সে—রহমান ভাই, তুমিও সর্দারের সঙ্গে এমন করে কোথায় ডুব মেরেছিলে বলোতো? এসেছো ভালোই হলো, সর্দারের গ্রেপ্তার-সংবাদ শুনে আমরা বড় অস্থির হয়ে পড়েছি।

রহমান মৃদু হেসে বললো—নিশ্চিন্ত থাকো ভাই সব, সর্দার বন্দী হয়েছে, তাতে অস্থির হবার কি আছে। তাকে আটকে রাখে, এমন শক্তি পৃথিবীর কারো নেই।

দরবার কক্ষস্থ সকলে জয়ধবনি করে উঠলো।

রহমান আসন গ্রহণ করে বললো—কায়েস, তোমাকে একটি কাজ করতে হবে।

বলো রহমান ভাই।

জাহাজ 'রকেটে' আমার অনেক মাল আছে।

মাল! বললো কায়েস।

হাঁ,সোনা-দানা-মনি-মুক্তা অনেক কিছু-----

কিন্তু সংবাদে জানতে পারলাম 'রকেটে'ই নাকি সর্দারকে বন্দী করে কান্দাই আনা হয়েছে।

হাঁ, আমিও সেই জাহাজে ছিলাম। আর শোন, ঐ জাহাজেই একটি গোপনকক্ষে বন্দী আছে 'শাহানশাহ' জাহাজের ক্যাপ্টেন জমরুদী!

ক্যাপ্টেন জমরুদী'রকেটে' বন্দী আছে! বলো কি রহমান ভাই?

রহমান এবার বললো—চলো বিশ্রামকক্ষে যাই, অনেক কথা আছে।

তখনকার মত দরবারকক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে এলো রহমান আর কায়েস।

অন্যান্য অনুচরগণ যে যার কাজে চলে গেলো।

রহমান তার নিজের বিশ্রামকক্ষে এসে বসলো। কায়েসকে বসার জন্য ইঙ্গিত করলো সে।

কায়েস আসন গ্রহণ করে বললো—রহমান ভাই, আমার কাছে সব যেন কেমন ঘোরালো লাগছে!

ঘোরালোর চেয়েও ঘোরালো ব্যাপার। সব শোন কায়েস।

বলো রহমান ভাই।

হাঁ কি বলছিলাম, জাহাজ 'রকেটে' একটি চোরা ক্যাবিনে বন্দী আছে 'শাহানশাহে'র আসল ক্যাপ্টেন জমরুদী। আর জমরুদীর বেশে 'শাহানশাহ'র ক্যাপ্টেনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম আমি।

তুমি?

হাঁ, শুধু ক্যাপ্টেন জমরুদীর ভূমিকায় অভিনয়ই করিনি, দস্যু বনহুরের ভূমিকাও অবশ্য করেছিলাম।

বলো কি রহমান ভাই!

বন্ধাই-এর গভর্ণর মিঃ রাজেন্দ্র ভৌমের কন্যা মিস এরুণকে হরণ করে লুকিয়ে রেখেছিলাম। মিঃ ভৌমের যথাসর্বস্ব আমি কেড়ে নিয়েছিলাম, শুধু তার আচরণে আমি ক্রুদ্ধ হয়ে এ কাজ করেছি।

তার অপরাধ?

গভর্ণর হয়ে তিনি গোপনে চোরা- চালানিদের সঙ্গে যোগাযোগ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এটা শুধু তার অপরাধ নয়—তার চরম পাপ। মিস এরুণাকে হরণ করার পিছনে আমার কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না, কিন্তু তাকে বন্দী করে রেখে মিঃ ভৌমকে আরও ভাবিয়ে তোলাই ছিলো আমার উদ্দেশ্য।

মিস এরুণা এখন কোথায়?

তাকে বন্ধাই তার পিতার কাছে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছি।

তার অসৎ উপায়ের অর্থ?

সেগুলো আমার কাছে আছে। শুধু সেগুলোই নয়, মন্থনার পুলিশ সুপার মিঃ মুখার্জীর প্রচুর সম্পদ আমি চুরি করে নিয়েছি। সেগুলো তাঁকে ফেরৎ দেওয়া সমীচীন মনে করিনি।

কারণ মন্থনা দ্বীপবাসীদের যা অবস্থা, সে সম্পদগুলি আমি মন্থনা দ্বীপবাসীদের মধ্যে বিলিয়ে দেবো মনস্থ করেছি।

তাহলে রহমান ভাই, তুমিই---

হাঁ কায়েস, যদিও এটা আমার চরম অপরাধ হয়েছে।

সর্দারের বেশ ধারণ করে আমিই দস্যু বনহুরের ভূমিকা অবলম্বন করেছিলাম। কান্দাই থেকে মন্থনা দ্বীপ, মন্থনা দ্বীপ থেকে বন্ধাই পর্যন্ত আমি প্রচন্ড এক ঝড় বইয়ে দিয়েছে। কিন্তু কেনো জানো? গলাটা কেমন যেন ভার হয়ে এসেছে রহমানের।

কায়েস একটু অবাক হয়ে তাকালো রহমানের মুখের দিকে।

রহমান আবার বলে চললো—সর্দারের সন্ধানে আমি বাধ্য হয়েছিলাম তার বেশ ধারণ করতে। জানতাম তার নাম নিয়ে কেউ যদি জঘন্য কুকর্ম শুরু করে তিনি তা সহ্য করবেন না, যেখানেই থাক বেরিয়ে পড়বেন, কুকর্মকারীকে শায়েস্তা না করে তিনি স্বস্তি পাবেন না। কায়েস, শুধুমাত্র সর্দারের আত্মপ্রকাশ কারণেই আমি এ কাজ করেছি, শুধু দস্যুতাই নয়—আমি মনের বিরুদ্ধে নারীহরণ পর্যন্ত করেছি।

রহমান ভাই, তুমিই তাহলে---

হাঁ, এসব আমারই কাজ। সেই কারণেই আমাকে ক্যাপ্টেন জমরুদীকে আটক রেখেছিলাম এবং সে এখনও 'রকেটে'র একটি গুপ্ত ক্যাবিনে বন্দী রয়েছে। আমার কিছু মালও আছে জাহাজটিতে।

কায়েস বলে উঠলো এবার—রহমান ভাই, সর্দার বন্দী হলেন কি করে?এবার বলো —পুলিশের কবল থেকে তার উদ্ধারের কি উপায় আছে?

উদ্ধারের উপায় একটা করতেই হবে। কিন্তু---কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলো রহমান।

কায়েস তাকিয়ে দেখলো, রহমানের মুখভাব গম্ভীর চিন্তাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণ মৌন থেকে কিছু ভেবে নিলো রহমান, তারপর বললো—কায়েস ,'রকেট' এক সপ্তাহ কান্দাইয়ে অপেক্ষা করবে। এই কদিনের মধ্যে ক্যাপ্টেন জমরুদীকে মুক্তি দিতে হবে, তারপর আমার মালগুলিও নামিয়ে নেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু কি করে এ সব সম্ভব হবে, রহমান?

সব সম্ভব হবে। আমার মালগুলি জাহাজের খোলসের মধ্যে রয়েছে তেলের ড্রামের মধ্যে। খালাসীরা আমার মাল নামিয়ে দেবে, তুমি

মহাজনের ছদ্মবেশে ড্রামগুলি গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে আসবে। আর আমি ক্যাপ্টেন জমরুদীর মুক্তির ব্যবস্থা করবো।

এবার বনহুরকে হাঙ্গেরী কারাকক্ষেই ফাঁসী দিয়ে হত্যা করা হবে। তাকে আর দুনিয়ার আলো দেখতে দেওয়া হবে না। কি করে এবার সে পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে হাঙ্গেরী কারাকক্ষ থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হয় দেখা যাবে।

৭ই জুন রাত্রি ১টায় দস্যু বনহুরকে হাঙ্গেরী কারাকক্ষে ফাঁসী দেওয়া হবে।

সংবাদটা পুলিশ মহল গোপন রাখতে চেষ্টা করলেও সুচতুর রহমানের কাছে গোপন রইলো না।

রহমানের মুখেই বনহুরের আস্তানার লোক জেনে ফেললো এ কথা। সমস্ত আস্তানা জুড়ে একটা দুশ্চিন্তার ঘনঘটা নেমে এলো। রহমান কিন্তু নীরব নিশ্চুপ, তার মুখে কোনো কথা নেই।

নাসরিন কেঁদে-কেটে আকুল হলো, এবার তাদের সর্দারের নিস্তার নেই। হাঙ্গেরী কারাগারে মৃত্যু তার সুনিশ্চিত।

আস্তানার সবাই যখন বনহুরের মৃত্যুদন্ডাদেশ শ্রবণ করে মুষড়ে পড়েছে তখন রহমান এক সময় হাজির হলো চৌধুরী বাড়ীতে।

অনেকদিন পর রহমানকে দেখে মনিরা প্রথমে নিজকে সংযত রাখতে পারলোনা। তার অন্তরের ব্যথা অশ্রু হয়ে নেমে এলো দু'নয়নে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো মনিরা—রহমান, তোমাদের সর্দার কোথায়?

প্রথমে রহমান মনিরার কথায় কোনো জবাব দিতে পারলো না, কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বললো—সর্দারের সন্ধান আমি জানিনা বৌরাণী।

মিথ্যে কথা বলতে তোমার এতোটুকু বাঁধলো না রহমান? তোমাদের সর্দার হাঙ্গেরী কারাকক্ষে বন্দী, একথা তুমি গোপন করতে চাও?

না।

তবে বলছিলে জানোনা?

এখনও বলছি আমি জানি না বৌরাণী।

রহমান, আমার কাছে মিথ্যে কথা! তোমাদের সর্দার মন্থনা দ্বীপে বন্দী হয়ে হাঙ্গেরী কারাকক্ষে মৃত্যুর জন্য প্রহর গুণছে, এ কথা তুমি অস্বীকার করতে চাও?

বৌরাণী! বৌরাণী....আমি জানিনা....আমি জানিনা।

আমি পাষাণ হয়ে গেছি রহমান। তুমি ভেবেছো, আমি তার বন্দী হবার কথা শুনে ভেংগে পড়বো, কিন্তু আর মুষড়ে পড়বো না। যাকে কোনোদিন বেঁধে রাখতে পারবো না, বৃথা তার মায়া....গলা ধরে আসে মনিরার।

রহমান বলে উঠলো—বৌরাণী, আজ আপনাকে একটা অনুরোধ করবো।

আঁচলে চোখ মুছে বললো মনিরা—বলো?

হাঙ্গেরী কারাগারে আপনাকে যেতে হবে।

কেন?

সর্দারের সঙ্গে আপনি সাক্ষাৎ করবেন।

কি করে তা সম্ভব রহমান?

আমি তার ব্যবস্থা করবো।

কান্দাই শহরে হাঙ্গেরী কারাগারে দস্যু বনহুর আবদ্ধ। তার মৃত্যুদন্ডের আদেশ প্রচার করা হয়েছে। এমতাবস্থায় তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যে অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার তাতে সন্দেহ নেই।

রহমান মনিরার সঙ্গে আরও কিছু সময় আলাপ আলোচনা করার পর নূরকে দেখতে চাইলো।

মনিরা নূরকে ডেকে পাঠালো, অল্পক্ষণেই সরকার সাহেবের সঙ্গে নূর এসে পৌছে গেলো।

রহমান ছদ্মবেশে এলেও নূর তাকে চিনে নিলো, লাফিয়ে কোলে চেপে গলা জড়িয়ে ধরলো—কাক্কু, আমার বাপি কই? আমার মাম্মী?

তোমার বাপি অনেক দূরে আছে নূর। আর তোমার মাম্মীতো এই তোমার সামনে।

না ও আমার মাম্মী নয়, আমার মা। বলোনা কাক্কু, মাম্মী আর আসেনা কেন?

আর সে কোনোদিন আসবে না। তুমি মার কাছে থাকো নূর।

মনিরা একটু গম্ভীর হলো, নূরকে লক্ষ্য করে বললো—যাও এবার নূর।

সরকার সাহেব হাত বাড়ালেন।

নূর রহমানের কোল থেকে সরকার সাহেবের কোলে লাফিয়ে পড়লো তারপর হেসে বললো—কাক্কু টা টা....

সরকার সাহেব নূরকে নিয়ে চলে গেলেন।

রহমান নূরের দিকে তাকিয়েছিলো, কি যেন চিন্তা করছিলো সে গভীরভাবে। হয়তো বা সর্দারের স্মৃতি স্মরণ হচ্ছিলো তার মনে।

মনিরা বললো—রহমান!

বলুন বৌরাণী?

একটা কথা আজ আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো, সঠিক জবাব দেবে তো?

নিশ্চয়ই দেবো। নিশ্চয়ই দেবো বৌরাণী, বলুন?

রহমান, নূরের কথা-বার্তা ও আচরণে আমি বেশ বুঝতে পারি নূর তোমাদের আস্তানাতেই ছিলো, এবং তোমাদের সর্দার এমন কাউকে তার মাম্মীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো যাকে সে আজও ভুলতে পারছে না।

রহমান মনিরার কথাগুলো নিশ্চুপ শুনে চললো।

মনিরা বলেই চলেছে—রহমান, তুমি ঠিক্ জবাব দাও—কে সে নারী এবং তোমাদের সর্দারের সঙ্গে কি তার সম্বন্ধ?

রহমান দস্যু বনহুরের সহকারী শ্রেষ্ঠ অনুচর। আজ সে একটা নারীর কাছে কাবু হয়ে গেলো। কি জবাব দেবে চট্ করে ভেবে উঠতে পারলোনা। ঢোক গিলে বললো—হাঁ, নূর আমাদের আস্তানাতেই ছিলো, কিন্তু কিছুদিন হলো সে আরাকানে আমার সঙ্গে গিয়েছিলো।

আরাকানে?

হাঁ, সেখানে আমার.....মানে আমার স্ত্রীর কাছে থাকতো। কাজেই আমার স্ত্রীকে সে মাম্মী বলে ডাকতো....আমার স্ত্রী নূরকে মনি বলে ডাকতো। ওরা উভয়ে উভয়কে নিবিড়ভাবে মা ও সন্তানের মত ভালবেসে ফেলেছিলো.....রহমান কথাগুলো বেশ থেমে থেমে বললো—দস্যু হলেও মিথ্যাবাদী নয় সে, মিথ্যা বলতে তার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছিলো।

মনিরা রহমানকে বিশ্বাস করতো, কাজেই রহমানের কথা সে মনপ্রাণে বিশ্বাস করলো।

রহমান এতোবড় একটা মিথ্যা কথা বলে আর দাঁড়াতে পারছিলোনা তাদের বৌরাণীর সম্মুখে, তখনকার মত বিদায় নিলো সে।

এতোদিন স্বামীর প্রতি একটা সন্দেহের দোলা লাগছিলো মনিরার মনে। রহমানের কথায় তার মনের আকাশ সচ্ছ হয়ে আসে। স্বামীর উপর যা অভিমান ছিলো সব নিঃশেষ হয়ে গেলো আজ।

❑

আগের চেয়ে প্রদীপ অনেকটা এখন ভাল।

মীরার সান্নিধ্য প্রদীপকে করে তুলেছে আরও সুষমামন্ডিত। মীরা সব সময় প্রদীপকে ঘিরে থাকে আবেষ্টনীর মত। মহারাজ জয়কান্ত বলেছেন আর এক সপ্তাহ পর প্রদীপ আর মীরার বিয়ে হবে।

মন্থনার ঘরে ঘরে আনন্দ উৎসব বয়ে চলেছে। সমস্ত মন্থনা দ্বীপ আলোকমালায় সজ্জিত করা হচ্ছে। নগরের সৌধ চূড়ায় এখন থেকেই বেড়ে চলেছে নহবতের সুমিষ্ট সুর। নারী-পুরুষ সকলে মুখেই আনন্দ উচ্ছাস।

মীরা আর প্রদীপকে কেন্দ্র করে মহানগরীর বুকে বয়ে চলেছে খুশির ফোয়ারা। মন্থনার ধনী-দরিদ্র সবাই মেতে উঠেছে—আনন্দে আত্মহারা সবাই।

মীরা প্রদীপকে নিয়ে স্বপ্নসৌধ গড়ে। হাসি-গানে সব সময় ওকে মাতিয়ে রাখে সে।

মন্থনা দ্বীপের সব বিপদ কেটে গেছে। এখানের প্রতিটি মানুষ আজ মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছে। দস্যু বনহুরের ভয়ে আজ তারা আর আতঙ্কগ্রস্ত নয়। কারণ দস্যু বনহুর হাঙ্গেরী কারাগারে বন্দী। ৭ই জুন রাত্রিতে তাকে হাঙ্গেরী কারাগারে ফাঁসী দিয়ে হত্যা করা হবে।

এ সংবাদ সুদূর মন্থনা দ্বীপেও পৌঁছে গেছে।

শুধু পুলিশ মহলেই নয়, সমস্ত নগরবাসীর মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে কথাটা, ৭ই জুন রাত্রিতে হাঙ্গেরী কারাকক্ষে দস্যু বনহুরকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হবে।

মহারাজ পুত্রবধু মীরাকে বহু মূল্যবান অলঙ্কারে ভূষিত করবেন। বিনা দ্বিধায় আজ তিনি ঘোষণা করেছেন, মীরার অলঙ্কারের মূল্যের পরিমাণ। মীরা আজ উচ্ছল আনন্দে আত্মহারা, প্রদীপের পাশে ছুটে গেলো খুশির আবেগে। সুডোল বাহু যুগল দিয়ে জড়িয়ে ধরলো প্রদীপের কণ্ঠ, ডাকলো—প্রদীপ!

উঁ।

এখনও তোমার মধ্যে দ্বিধা?

উঁ হুঁ।

আজও তুমি আমাকে নিজের করে নিতে পারলেনা?

প্রদীপ তার বলিষ্ঠ বাহু দুটি দিয়ে দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করলো মীরাকে, কিন্তু পর মুহূর্তে শিথিল হয়ে এলো তার হাত দু'খানা।

মীরা বললো—কি হলো তোমার?

কিছু না। চলো মীরা, ঘরে ফিরে যাই।

কেন, এই মনোরম সুন্দর ফুলে ফুলে ভরা বাগান, লতা-গুল্মে ঘেরা কুঞ্জবন ভাল লাগছেনা তোমার কাছে?

না।

কেন? ওঃ ভয় হচ্ছে বুঝি তোমার? আবার যদি দস্যু বনহুর হানা দিয়ে বসে....

অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো প্রদীপ—দস্যু বনহুর! প্রথম যেন তার কানে প্রবেশ করলো শব্দটা।

মীরা বললো আবার—তুমি শোননি প্রদীপ, দস্যু বনহুর আজ কান্দাই হাঙ্গেরী কারাগারে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে!

প্রদীপের চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে মীরার মুখে।

মীরা বলে চলেছে—আর সে আসতে পারবেনা মন্থনা দ্বীপে। কাজেই ভয় নেই তোমার।

প্রদীপ তখনও এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে, মীরার মুখে কিসের যেন সন্ধান করে ফিরছে। প্রদীপের মুখভাব গম্ভীর হয়ে উঠলো।

মীরা ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—কি হলো তোমার?

প্রদীপ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছিলো, আবার তাকালো মীরার দিকে।

সে দৃষ্টি যেন প্রদীপের নয়। চমকে উঠলো মীরা, কম্পিত গলায় বললো—অমন করে কি দেখছো আমার মুখে?

প্রদীপ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো, গম্ভীর গলায় বললো—দস্যু বনহুর বন্দী হয়েছে, এ কথা তুমি জান কি করে?

এবার মীরা হেসে উঠলো—সমস্ত পৃথিবীর লোক জানে আর আমি জানবোনা। দস্যু বনহুর যা উপদ্রব শুরু করেছিলো, দেখলে তো তোমার উপর কিভাবে সে অন্যায় আচরণ করলো? তোমাকে বেঁধে রেখে আমাকে নিয়ে কিভাবে উধাও হয়েছিলো। তুমি যাই বলো প্রদীপ, দস্যুটাকে লোকে যতই বদ বলুক, আমি কিন্তু তাকে সমীহ করি....

আবার তাকালো প্রদীপ মীরার মুখে।

মীরা বলে চলেছে—আমাকে বন্দী করে নিয়ে যাবার পর সে এতোটুকু কোনো অন্যায় আচরণ করেনি আমার সঙ্গে।

প্রদীপ এতোক্ষণে কথা বললো—দস্যু বনহুরকে তুমি দেখেছো নিশ্চয়ই?

এবার মীরা ভাবাপন্ন হলো—প্রদীপ, দস্যু বনহুর আমাকে হরণ করে নিয়ে গেলেও আমি তাকে দেখবার সৌভাগ্য লাভ করিনি।

কারণ?

কারণ তার মুখ সব সময় মুখোসে ঢাকা থাকতো।

প্রদীপ ভ্রূকুঞ্চিত করে কিছু চিন্তা করতে লাগলো।

মীরা বললো—কি ভাবছো প্রদীপ?

উঁ!

কি ভাবছো তুমি?

উঠে দাঁড়ায় প্রদীপ,—চলো প্রাসাদে যাই, রাত অনেক হলো।

মীরা অনেক দিন পর আজ প্রথম শুনলো প্রদীপের গলার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর। আনন্দে আপ্লুত হলো তার হৃদয়। বললো মীরা—চলো যাই।

প্রদীপ আর মীরা পায়ে পায়ে এগুচ্ছে, প্রতিদিনের মত প্রদীপের বাম হস্তখানা মীরার দক্ষিণ হস্তের মুঠায় ধরা রয়েছে।

প্রদীপ বললো—মীরা তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে।

বেশ তো বলো?

এখানে নয়, রাজপ্রাসাদে চলো।

আচ্ছা প্রদীপ, তুমি একদিন আমার ওখানে না গেলে বাঁচতে না। অস্থির হয়ে পড়তে, নানা ছলনায় তুমি হাজির হতে আমার কক্ষে। তারপর মনে পড়ে—তুমি আর আমি কোন্ অসীমে মিশে যেতাম? কত কথা, কত হাসি—রাত ভোর হয়ে আসতো, তবু তুমি যেতে চাইতে না.....

তারপর মীরা, তারপর? ব্যাকুল আগ্রহে প্রশ্ন করলো প্রদীপ।

আমি তোমাকে জোর করে তাড়িয়ে দিতাম, তুমি বলতে—মীরা, তোমাকে ছেড়ে এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছা হয় না—মনে হয়, তোমাকে সব সময় বাহুবন্ধনে বেঁধে রাখি.....

মীরা!

হাঁ, সব তুমি ভুলে গেছো প্রদীপ?

তারপর মীরা?

চলো আমার ঘরে বসে সব বলবো। যাবে আজ আমার ওখানে?

চলো, যাবো।

প্রদীপ আর মীরা মন্ত্রি-প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলো, এক্কা ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে রওনা দিলো ওরা।

প্রদীপ আর মীরা বসে আছে পাশাপাশি। মীরার ওড়নার আঁচলখানা বাতাসে উড়ে উড়ে পড়ছিলো প্রদীপের চোখে-মুখে।

প্রদীপ নিশ্চুপ বসেছিলো পথের দিকে তাকিয়ে, কিছু যেন সে গভীরভাবে চিন্তা করছে! ললাটে ফুটে উঠেছে গভীর চিন্তার ছাপ।

মীরা প্রদীপের হাতখানা নিজের হাতের মুঠায় টেনে নিয়ে বলে—প্রদীপ, কি ভাবছো?

কিছু না।

প্রদীপ, তুমি কিন্তু আগের চেয়ে অনেক গম্ভীর হয়ে গেছো, কই আগে তো তুমি অমন ছিলে না? কত দুষ্ট ছিলে তুমি! আমাকে অস্থির করে তুলতে, এক মুহূর্ত তুমি আমাকে চুপ থাকতে দিতে না। একটু গম্ভীর হলেই বলতে, আমার উপর রাগ করেছো মীরা? যতক্ষণ না হাসতাম ততক্ষণ তুমি যেন স্বস্তিই পেতে না। আর এখন তুমি যেন কেমন হয়ে গেছো? প্রদীপ, জানি শিকারে গিয়ে তুমি মাথায় আঘাত পেয়েছিলে?

শিকারে?

হাঁ, মনে নেই তোমার? তা থাকবে কি করে! ডাক্তার বলেছিলেন—তোমার স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরতে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে।

প্রদীপের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠে, বিপুল আগ্রহে বলে সে—মীরা, আমি সব জানতে চাই তোমার কাছে।

চলো, সব বলবো। তবু যদি স্মরণ হয় তোমার! আবার যদি তোমাকে আগের মত করে ফিরে পাই!

তুমি বলো মীরা, আমি আর ধৈর্য ধরতে পারছি না।

প্রদীপ, যেদিন তুমি শিকারে যাও তখন আমি অসুস্থ ছিলাম—

হাঁ, মনে পড়েছে একটু একটু.....

সত্যি?

হাঁ মীরা।

বার বার শিকারে যাওয়া কালে আমি তোমার সঙ্গে যেতাম, মনে আছে তোমার?

প্রদীপ গভীরভাবে চিন্তা করে বলে—হাঁ, এবার ঠিক স্মরণ হচ্ছে। আমি যখন শিকারে যেতাম, তুমি থাকতে আমার পাশে।

প্রদীপের মুখে পূর্ব কথা শুনে মীরার আঁখি দু'টি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে, বলে চলে মীরা—আমি সেবার অসুস্থ থাকার জন্য তোমার সঙ্গে যেতে পারলাম না। বিদায় কালে আমার হাত ধরে তুমি বলেছিলে—শিকারে গেলাম মীরা কিন্তু আমার প্রাণ পড়ে রইল এখানে.....

মীরা!

প্রদীপ, তারপর শিকার থেকে সবাই ফিরে এলো, শুধু এলেনা তুমি। সবাই এসে বললো—ঝড়-তুফানে কোথায় তুমি হারিয়ে গেছো। প্রাণে বেঁচে আছো কিনা তাও কেউ বলতে পারলো না। তোমার অভাবে মন্থনা দ্বীপে এক মহাশোকের ছায়া নেমে এলো। মহারাজ আর মহারাণী একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে বিশ্বকে অন্ধকার দেখলেন। মন্থনার আনন্দ-হাসি-গান চিরতরে মুছে গেলো, মুছে গেলো সবার খুশী। আমার মনের অবস্থা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না প্রদীপ....

গলা ধরে আসে মীরার।

প্রদীপ তন্ময় হয়ে শোনে।

বলে আবার মীরা....মন্থনা দ্বীপবাসী যখন শোকে মূহ্যমান, মহারাজ মহারাণী যখন কেঁদে কেঁদে অন্ধ হবার জোগাড়, তখন হঠাৎ তোমাকে পাওয়া গেল মন্থনার হসপিটালে—তিন নম্বর বেডে। জানা গেলো, কোন্ জেলে নৌকায় তোমাকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করেছে সারথী নদীবক্ষ থেকে।

সারথী নদী! অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো প্রদীপ।

হাঁ, সারথী নদী থেকেই তোমাকে জেলেরা উদ্ধার করে মন্থনা হসপিটালে দিয়েছিলো। সার্জন বলেছিলেন তখন তোমার যা অবস্থা ছিলো, অতি আশঙ্কাজনক। মাথায় ভীষণ আঘাত পেয়ে তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছো। সম্পূর্ণ তিন সপ্তাহ পর ফিরে এলো বটে, কিন্তু স্বাভাবিক জ্ঞান তুমি লাভ করলে না। তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজন, এমন কি তোমার পিতা-মাতাকে চিনতে পারলে না, আমাকেও না.....প্রদীপ, বলো এখনও কি তুমি আমাকে চিনতে ভুল করছো?

না, মীরা।

তবে তুমি ঠিক আগের মত করে আমাকে গ্রহণ করতে পারছো না কেন?

মীরা.....

বলো?

না, থাক বলবো পরে।

মীরা বললো—এই তো এসে গেছি।

ঘোড়াগাড়ী থেমে পড়লো, প্রদীপ আর মীরা নেমে দাঁড়ালো।

প্রদীপ নতুন দৃষ্টি নিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

মীরা হেসে বললো—আজ কি তুমি নতুন এলে প্রদীপ? অমন করে কি দেখছো?

কিছু না, চলো।

মীরাকে অনুসরণ করে প্রদীপ।

মীরা অন্তপুরে প্রবেশ করে ডাকে—মা মা, দেখে যাও কে এসেছে।

কন্যার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরে মন্ত্রিপত্নী লতারাণী এগিয়ে আসেন, মীরার সঙ্গে রাজকুমার প্রদীপকে বহুদিন পর তাঁর বাড়ীতে আসতে দেখে উচ্ছল খুশীভরা কণ্ঠে বলেন—প্রদীপ, বাবা তুমি এসেছো?

প্রদীপ কোনো জবাব দিতে পারে না, থ' মেরে দাঁড়িয়ে থাকে।

মীরা হেসে বলে—কই মাকে প্রণাম করছো না যে?

ও! প্রদীপ কেমন যেন বিব্রত বোধ করে। মীরার কানে মুখ দিয়ে বলে—কেমন করে প্রণাম করতে হয় শিখিয়ে দাও মীরা?

হেসে উঠে মীরা—প্রণাম করাটাও ভুলে গেছো? মীরা মায়ের পায়ের কাছে বসে প্রণাম করে প্রদীপকে শিখিয়ে দেয়।

প্রদীপ মীরার অনুসরণে লতাদেবীকে প্রণাম করে।

❑

মীরার কক্ষে প্রবেশ করতেই প্রদীপ থমকে দাঁড়ালো, বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে অগ্রসর হলো প্রদীপ ওপাশের দেয়ালে টাঙ্গানো প্রদীপ আর মীরার বড় ছবিখানার দিকে।

ছবিখানার নীচে এসে দাঁড়ালো প্রদীপ, স্থির অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো। ছবিখানা যেন জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে, মীরা আর প্রদীপ দাঁড়িয়ে রয়েছে পাশাপাশি। উভয়ের হাতের মুঠায় হাত, শরীরে শিকারীর ড্রেস। দু'জনার পিঠের সঙ্গেই রাইফেল বাঁধা রয়েছে। হাসছে ওরা আপন মনে।

প্রদীপ অবাক হয়ে দেখছে ছবিখানা।

মীরা এসে দাঁড়ালো তার পাশে, হেসে বললো—অমন আশ্চর্য হয়ে কি দেখছো? ভুলে গেছ বুঝি তোমার আর আমার সেদিনের কথা?

প্রদীপের আঁখি দু'টি ছবি থেকে ফিরে এলো মীরার মুখে, প্রদীপের চোখে রাশিকৃত বিস্ময়।

মীরা প্রদীপের হাত ধরে বললো—এসো।

খাটের উপর প্রদীপকে বসিয়ে দিয়ে মীরা ওর কোলো মাথা রেখে শুয়ে পড়লো, বামহস্ত দিয়ে প্রদীপের কণ্ঠ বেষ্ঠন করে ধরে বললো—কতদিন পর আমার ঘরে এলে বলতো?

উঁ।

কেমন যেন আনমনা হয়ে গেছো তুমি?

প্রদীপ যেন অস্বস্তি রোধ করছে। মীরার হাতখানা ক্রমে আকর্ষণ করছে প্রদীপকে।

মীরা কিসের প্রতিক্ষায় উন্মুখ হয়ে উঠেছে। কোমল পাপড়ির মত আঁখি দু'টিতে ভাবময় চাহনি, সরু ওষ্ঠদ্বয়ে মৃদু মৃদু হাসির রেখা, বাহু দু'টি তার কণ্ঠ বেষ্টন করে আছে।

প্রদীপ মীরার মুখ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তাকায় দেয়ালে ছবির প্রদীপের মুখে।

মীরা অভিমান ভরাকণ্ঠে বলে—প্রদীপ কি দেখছো?

ঐ ছবির চোখ দুটো আমার দিকে কেমন করে তাকাচ্ছে দেখো।

হেসে উঠে মীরা—সে তো তুমি। প্রদীপ, আজ তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে দেবো না।

কি করবে তুমি আমাকে নিয়ে?

অনেক কথা জমে আছে, অনেক হাসি-গান—সব আজ উজাড় করে শোনাবো তোমাকে।

কিন্তু আমি যে বড় অস্বস্তি বোধ করছি মীরা।

অস্বস্তি! কি হয়েছে তোমার?

বড্ড মাথা ব্যথা। বড্ড মাথা.....দুই হাতে প্রদীপ নিজের মাথাটা টিপে ধরে!

খুব কি অসুস্থ বোধ করছো?

খুব।

তাহলে ডাক্তার ডাকি?

না না, ডাক্তারের কোনো দরকার হবে না। মীরা, একটু ঘুমাতে পারলে আমি ঠিক সুস্থ হয়ে যাবো, কিন্তু তোমার ঘরে ঘুমানো তো চলবে না।

কেন?

বিয়ে তো আমাদের এখনও হয়নি, তাই যদি তোমার বাবা মা......

আজ কি তুমি নতুন এসেছো আমার ঘরে? আমার বাবা মা তোমাকে অনেক দিন বরণ করে নিয়েছেন প্রদীপ, আমাদের মনের বিয়ে হয়ে গেছে অনেকদিন। লোক দেখানো লৌকিকতাটুকু বাকী আছে মাত্র; একথা তুমিই তো বলেছো আমাকে।

মীরা, সব ভুলে গেছি, সব ভুলে গেছি আমি। আমি নিজকে নিজেই জানিনে—কে আমি!

প্রদীপ!

হাঁ মীরা।

তুমি বড্ড অসুস্থ, এসো আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ো, আমি তোমার চুলে আংগুল বুলিয়ে দিই।

প্রদীপ মীরার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো।

রাত বেড়ে আসছে।

প্রদীপ ঘুমিয়ে পড়লো এক সময়।

মীরার চোখেও নেমে এলো নিদ্রার পরশ।

প্রদীপের মাথাটা ধীরে ধীরে বালিশে নামিয়ে রেখে নির্নিমেশ নয়নে তাকিয়ে রইলো ওর নিদ্রিত মুখের দিকে। এক সময় মোহগ্রস্তের মত মীরার মুখখানা ঝুকে এলো প্রদীপের মুখে। অপূর্ব এক অনুভূতি নাড়া দিয়ে গেলো মীরার হৃদয়ে।

প্রদীপের বুকের উপর হাত রেখে মীরাও ঘুমিয়ে পড়লো।

নিস্তব্ধ কক্ষে শুধু জেগে রইলো দেয়াল ঘড়িটা। টিক্ টিক্ করে বেজে চলেছে, কালের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে এক এক করে মুহূর্তগুলি।

ঢং ঢং করে দেওয়াল ঘড়িটা রাত দুটো ঘোষণা করলো। আধুনিক মডার্ণ ঘড়ি, একটা সুমিষ্ট সুরের রেশ ঘরময় ছড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণের জন্য।

বুকের উপর থেকে মীরার হাতখানা আস্তে সরিয়ে রেখে উঠে বসলো প্রদীপ, মীরাকে তাকিয়ে দেখে নিলো। এক থোকা রজনীগন্ধার মত মীরার দেহটা এলিয়ে পড়ে আছে তার পাশে। প্রদীপের চোখ দুটো উজ্জ্বল তীব্র হয়ে উঠলো, হাতখানা এগিয়ে গেলো ওর দিকে, কিন্তু পর মুহূর্তে প্রদীপ সরিয়ে নিলো হাতখানা, শয্যা ত্যাগ করে প্রদীপ আর মীরার ছবিখানার পাশে এসে দাঁড়ালো। স্থির নয়ন মেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপর আবার তাকালো নিদ্রিত মীরার দিকে, আবার তাকালো সে ছবির প্রদীপের মুখে, অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো—প্রদীপ, তুমি আজ হাঙ্গেরী কারাগারে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছো। আর দস্যু বনহুর তোমার আসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে রাজকুমার প্রদীপ বনে বসে আছে। প্রদীপের মৃত্যু হবে, মন্থনার রাজা হবে দস্যু বনহুর, অপ্সরীর মত সুন্দরী মীরা হবে তার প্রেয়সী.....নিয়তির কি পরিহাস! কিন্তু দস্যু বনহুর নিয়তিকেও প্রশ্রয় দেবেনা, এতো বড় একটা নির্মম অন্যায় সে হতে দেবেনা কখনও। রাজ্য-সুখ, নারী-রত্ন লাভ দস্যু বনহুরের কামনা নয়। নিয়তিকে পরিহার করে বনহুর ফিরিয়ে আনবে প্রদীপকে।

প্রদীপ রূপ মুছে যায়, সেখানে জেগে উঠে এক দূর্দান্ত কঠিন পুরুষ-প্রাণ।

অন্তপুর থেকে বেরিয়ে আসে দস্যু বনহুর।

অদূরে সিংহদ্বারে রাইফেলধারী পাহারাদার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছিলো।

বনহুর সন্তর্পণে পিছন থেকে এগিয়ে যায়, দৃঢ় মুষ্ঠিতে চেপে ধরে পাহারাদারের গলা। একটা গোঙ্গানীর মত শব্দ বেরিয়ে আসে পাহারাদারের কণ্ঠ দিয়ে। বনহুরের হাতের মধ্যে শিথিল হয়ে আসে পাহারাদারের দেহটা, আস্তে করে ভূতলে শুইয়ে দিয়ে ওর শরীর থেকে খুলে নেয় ড্রেসটা।

অল্পক্ষণের মধ্যে পাহারাদারের ড্রেসে সজ্জিত হলো দস্যু বনহুর। রাইফেলটা তুলে নিলো হাতের মুঠায়।

অন্য একজন পাহারাদার বুঝি গোঙ্গানীর শব্দটা শুনতে পেয়েছিলো, তাই লণ্ঠন হাতে এগিয়ে আসছিলো এইদিকে।

বনহুর দ্রুত হস্তে পাহারাদারের জ্ঞানহীন শিথিল দেহটা সিংহদ্বারের আড়ালে সরিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুতে লাগলো।

পাহারাদারটি লণ্ঠন উঁচু করে এগিয়ে এলো—এদিকে কিসের শব্দ হলো ভাই?

হাঁ, আমিও ঐ রকম শব্দ শুনতে পেয়েছি, কিন্তু এদিকে কেনো—ঐদিকে।

ঐদিকে?

হাঁ।

পাহারাদার অপর দিকে চলে গেলো।

বনহুর ঘোড়াশালের দিকে এগিয়ে গেলো, সহিসদের একজন ঘোড়াশালের পাশে ঘুমিয়েছিলো—লোকটা হঠাৎ জেগে উঠলো—কে?

বনহুর ব্যস্তকণ্ঠে বললো—রাজকুমার প্রদীপ হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছে, রাজপ্রাসাদে খবর দিতে হবে, একটা ভাল অশ্ব বেছে দাও।

আচ্ছা হুজুর, দিচ্ছি।

সহিস ঘোড়াশালে প্রবেশ করে একটা বলিষ্ঠ অশ্ব নিয়ে ফিরে এলো।

বনহুর আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে চেপে বসলো অশ্বপৃষ্ঠে।

মন্থনার পথঘাট বনহুরের পরিচিত নয়, কাজেই কোন্ দিকে যাবে; বনহুরের উদ্দেশ্য বন্দরে পৌঁছে কান্দাইগামী জাহাজে সে ফিরে যাবে। যেমন করে হোক উদ্ধার করবে সে প্রদীপ কুমারকে।

কিন্তু কোনদিকে বন্দর জানা নেই দস্যু বনহুরের। একটি টাঙ্গীওয়ালা পথের ধরে টাঙ্গী রেখে তার উপর নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছিলো।

বনহুর অশ্ব থেকে নেমে পড়লো, এক ধাক্কায় টাঙ্গীওয়ালাকে জাগিয়ে দিয়ে বললো—এই, রাজার হুকুম, তোকে আমার সঙ্গে বন্দরে যেতে হবে টাঙ্গী নিয়ে।

টাঙ্গী ওয়ালা চোখ মেলে তাকাতেই দেখতে পেলো—রাজমন্ত্রি-চিহ্নযুক্ত পোষাক পরিহিত পাহারাদার তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। বুকটা কেঁপে উঠলো টাঙ্গী চালকের, বিনীত কণ্ঠে বললো—হুজুর, এতো রাতে বন্দরে যেতে হবে কেনো?

রাজ-আত্নীয় আসবেন, তাই তাকে আনতে।

আর কোনো কথা বলতে সাহসী হলোনা টাঙ্গীচালক।

বনহুর অশ্ব সংযত করে টাঙ্গীর পিছনে অগ্রসর হলো।

বন্দরে পৌঁছতে বহু সময় লাগলো তার।

টাঙ্গী চালকের জিম্মায় অর্শ্ব রেখে বনহুর বন্দরের দিকে চলে গেলো। বলে গেলো বনহুর—আমার ফিরতে যদি খুব বিলম্ব হয় তবে তুমি ফিরে যেও, এবং অশ্বটি মন্ত্রি-বাড়ীতে পৌঁছে দিও।

আচ্ছা হুজুর, তাই করবো। বললো টাঙ্গীচালক।

বনহুর বন্দরে প্রবেশ করতেই সবাই রাজপাহারাদার দেখে সম্মানে পথ ছেড়ে দিলো।

বরাৎ ভাল বলতে হবে, বনহুর বন্দরে পৌছতেই শুনতে পেলো—একটি জাহাজ এই দন্ডে কান্দাই অভিমুখে রওয়ানা দিবে।

বনহুর রাজপাহারাদারের বেশেই জাহাজে উঠে বসলো, জাহাজের ক্যাপ্টেন তার সুখ-সুবিধামত ব্যবস্থা করে দিলো।

মন্থনা দ্বীপের রাজপাহারাদার হিসাবে বনহুর জাহাজে যথেষ্ট সম্মান পেতে লাগলো।

❑

দুইদিন দুই রাত্রি জাহাজে কাটানোর পর বনহুর কান্দাই বন্দরে অবতরণ করলো।

নতুন জীবন লাভ করার পর বনহুরের এই প্রথম কান্দাই আগমন। বনহুর কান্দাই পৌছে একটা হোটেলে আশ্রয় নিলো। কান্দাই এর পুলিশ মহলের অনকেই দস্যু বনহুরের আসল রূপ চেনেন, কাজেই স্বাভাবিক ড্রেসে বনহুর এ শহরে প্রবেশ করলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। বনহুরের মনে পড়লো আস্তানার কথা, মনে পড়লো স্ত্রী মনিরার কথা আর পুত্র নূর। কিন্তু সব মুছে ফেললো সে মন থেকে, সব কাজের প্রথম তাকে উদ্ধার করতে হবে মন্থনার রাজকুমার প্রদীপকে। কান্দাই পৌছেই সে জানতে পেরেছে—আর তিন দিন মাত্র বাকী আছে দস্যু বনহুরকে ফাঁসীমঞ্চে ঝোলাবার। ৭ই জুন এগিয়ে আসছে দ্রুতগতিতে; তার পূর্বে প্রদীপ কুমারকে মুক্ত করে আনতে হবে।

বনহুর হোটেলের কামরায় পায়চারী করছে আর গভীরভাবে চিন্তা করছে, সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চলেছে সে।

কান্দাই পৌছেই বনহুর তার ড্রেস পরিবর্তন করে নিয়েছিলো। শুধু পাজামা আর পাঞ্জাবী শোভা পাচ্ছিলো তার শরীরে। হোটেলের বয় বনহুরের অর্ডারমত খাবার দিয়ে গেলো।

বনহুর তখন পিছন দিকে মুখ করে দাড়িয়ে রইলো।

বয় চলে যাচ্ছিলো, বনহুর বললো—বাথরুমে পানি আসছেনা কেনো দেখোতো? টাঙ্কিতে কি পানি নেই?

স্যার, পানি থাকবেনা কেন, সমস্ত হোটেলের জন্য প্রচুর পানি মজুত আছে টাঙ্কিতে। আচ্ছা আমি দেখছি......

বয় বাথরুমে প্রবেশ করতেই বনহুর প্রবেশ করলো তার পিছনে।

তারপর বনহুর যখন বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো তখন তার সম্পূর্ণ রূপ পাল্টে গেছে। কেউ দেখলে তাকে চিনতেই পারবে না; হোটেলের বয় বলেই মনে হচ্ছে তাকে সম্পূর্ণভাবে।

বনহুর ট্রে আর প্লেট হস্তে বেরিয়ে এলো। তারপর আলমারী খুলে সব চেয়ে মূল্যবান ভাল মিষ্টি সাজিয়ে নিলো একটা টিফিন ক্যারিয়ারে। আবার ফিরে গেলো সে নিজের ক্যাবিনে।

হোটেলের অন্যান্য লোকজন সবাই মনে করলো—সাতাশ নম্বর ক্যাবিনের ভদ্রলোক বুঝি মিষ্টির অর্ডার দিয়েছে।

নিজের কক্ষে প্রবেশ করে বনহুর দ্রুত হস্তে বয়ের ড্রেস খুলে পরে নিলো নিজের পাজামা আর পাঞ্জাবী; তার পর খচ্ খচ্ করে দুটো চিঠি লিখে নিয়ে পকেটে রাখলো। টিফিন ক্যারিয়ার হস্তে বেরিয়ে এলো সকলের অলক্ষ্যে ফুটপাতে।

অদূরে একটা ভাড়াটে ট্যাক্সি যাত্রী নামিয়ে দিয়ে ষ্টার্ট নিচ্ছিলো, বনহুর দ্রুত এগিয়ে উঠে বসে বলে—চলো পুলিশ অফিসে, আর শোন, একটা চিঠি পোষ্ট করবো, পথে কোনো পোষ্ট বক্স দেখলে এক মিনিটের জন্য গাড়ী রাখবে।

আচ্ছা স্যার। ড্রাইভার গাড়ী ছাড়লো।

কয়েক মিনিট চলার পর একটা পোষ্ট বক্স দেখে গাড়ী রাখলো ড্রাইভার, বললো—দিন স্যার, আমি দিয়ে আসি।

বনহুর চিঠিখানা বের করে ড্রাইভারের হাতে দিলো, ড্রাইভার নেমে গেলো গাড়ী থেকে।

বনহুর লক্ষ্য করছে—ড্রাইভার চিঠিখানা পোষ্ট বক্সে ছেড়ে দিতেই, সে চট্ করে ড্রাইভ্ আসনে বসে হ্যান্ডেল চেপে ধরে ষ্টার্ট দিলো।

ড্রাইভার প্রথমে একটু থতমত খেয়ে গেলো, তারপর দ্রুত দৌড়ে এলো কিন্তু গাড়ীখানা নিকটে পৌছাবার পূর্বেই তার সম্মুখ দিয়ে সাঁ করে চলে গেলো গাড়ীখানা।

ড্রাইভার হাবার মত দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক সেকেন্ডের জন্য, তারপর চীৎকার করে হই-হুল্লোড় শুরু করে দিলো!

এখানে ড্রাইভার যখন চেঁচামেচি করছে, তখন হোটেলের মধ্যেও শুরু হয়েছে এক মহা হই-চই কান্ড।

বনহুর সোজা তখন গাড়ী নিয়ে অগ্রসর হলো জজ কোয়ার্টারের দিকে।

জজ সাহেব বিচারালয়ে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন, ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছে।

বনহুর তার গাড়ীখানা নিয়ে পৌঁছে গেলো জজ সাহেবের গাড়ীর পাশে। দারওয়ান এসে জিজ্ঞাসা করলো—আপ কাহা ছে আয়া?

বনহুর বললো—জজ সাহাব কো মিঠাই লে আয়া, তুম লে যাও অন্দর মে।

মিঠাই, কোন্ ভেজা?

তুমি লে যাও, জজ সাহাব জানতে সব।

বহুৎ আচ্ছা। চলে যায় দারওয়ান।

ড্রাইভারটা ছাড়া আর কেউ নেই আশেপাশে, বনহুর ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বললো—ভাই, আমার গাড়ীখানা হঠাৎ কেমন যেন বেয়াড়া হয়ে পড়েছে, একটুা যদি আমাকে সাহায্য করতেন!

ড্রাইভার গর্বিতভাবে বললো—কি রকম?

মানে, ঠিক বুঝতে পারছিনে, একটু চালিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন। হাজার হলেও আপনি ড্রাইভার—গাড়ী সম্বন্ধে আপনাদের তুলনায় আমরা একেবারে অজ্ঞ। মেহেরবানী করে যদি একটু....মানে দু'মিনিট.....

ড্রাইভার জানে, সাহেব বেরুতে আরও অর্দ্ধঘন্টা সময় লাগবে। নেমে এলো গাড়ী থেকে।

বনহুর ড্রাইভ আসনের পাশে উঠে বসে দরজা খুলে ধরলো—আসুন।

ড্রাইভার বনহুরের ভদ্র ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেছে, কোনো-রকম বিলম্ব না করে উঠে পড়লো—ষ্টার্ট দিয়ে গাড়ী বের করে নিয়ে চললো রাস্তায়।

বনহুর তার সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট বের করে গুঁজে দিলো ড্রাইভারের ঠোঁটের ফাঁকে, তারপর ম্যাচ জ্বেলে সিগারেট ধরিয়ে দিলো।

বনহুর ঠোটের ফুঁকে সিগারেট চেপে ধরে এক মুখ ধুয়া ছেড়ে বললো—কিছু বুঝতে পারছেন?

ড্রাইভারের ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট, দাঁতে চেপে ধরে বললো—আছে, খুব একটা দোষ আছে গাড়ীখানার। আপনারা তেমন ধরতে পারবেন না, আচ্ছা আমি ঠিক করে দিচ্ছি।

কথায় কথায় বেশ কিছুটা পথ অতিক্রম করে এসেছে তারা। বনহুর বললো—আর একটু চালালেই আরও ভালভাবে অনুভব করবেন।

কিন্তু আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারছিনে, কারণ স্যার বেরিয়ে পড়বেন।

ওদিকের গলির ভিতর দিয়ে চলুন ড্রাইভার সাহেব, মাত্র দু'মিনিট সময় লাগবে।

ঠিক বলেছেন। ড্রাইভার গাড়ী ব্রেক করে গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নিলো। জনহীন গলিপথ।

গলির মাঝপথে গাড়ী আসতেই হঠাৎ পাঁজরে ঠান্ডা কিছু অনুভব করলো ড্রাইভার।

বনহুর কঠিন কণ্ঠে বললো—খবরদার, চীৎকার করবে না! সঙ্গে সঙ্গে মরবে!

ড্রাইভার হঠাৎ চমকে উঠলো, ভাবতেও পারে নি, তার পাঁজরে একটি আগ্নেয় অস্ত্র ঠেশে ধরা হয়েছে। বনহুরের কণ্ঠস্বরে ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে উঠলো ড্রাইভারের মুখমন্ডল। একটু আড়নয়নে দেখে নিয়ে আবার তাকালো সম্মুখে রাস্তায় জন-হীন নির্জন গলিপথ। ড্রাইভার বুঝতে পারলো যে নিশ্চয়ই কোনো ডাকু বা দস্যু কবলে পড়েছে—উপায় নেই রক্ষার।

বনহুর কঠিন কণ্ঠে বললো—গাড়ী রুখো।

বাধ্য হলো ড্রাইভার গাড়ী থামিয়ে দিতে।

এবার বননহুর রিভলভার ঠিক রেখে ড্রাইভারকে গাড়ী থেকে নামতে বললো—পাশেই একটি বাড়ী , দরজায় চক মাটি দিয়ে লিখা আছে "বাড়ী ভাড়া দেওয়া হইবে"। বনহুর ডাইভারসহ সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলো। তখনও ড্রাইভারের পিঠে ঠেকে রয়েছে বনহুরের হস্তের রিভলভারের শক্ত আগাটা।

একটু শব্দ করতে পারলো না ড্রাইভার, মৃত্যুভয় কার না আছে!

বনহুর একটা খালি কক্ষে ড্রাইভারকে বন্দী করে তার শরীর থেকে ড্রাইভারের ড্রেস খুলে নিলো, তারপর দ্রুত পরে নিলো ড্রেসটা। যদিও ঠিকভাবে শরীরে খাপ খাচ্ছিলো না তবু কোনো রকমে চাপিয়ে নিলো।

অতি দ্রুত ড্রেস পরে নিয়ে শিকল টেনে দিলো দরজায়। ভাগ্যিস বাড়ীর সদর গেটটা আগলা ছিলো। তাই বেগ পেতে হলো না দস্যু বনহুরকে।

ড্রাইভারের ড্রেসে গাড়ী নিয়ে ছুটলো জজ কোয়ার্টারের দিকে।

কিন্তু বনহুর এবার গাড়ী নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো না। গাড়ীখানা পথের উপর একধার করে রেখে তাড়াহুড়ো করে ভিতরে প্রবেশ করলো, এবং খুশী হলো—তখনও জজ সাহেব গাড়ীর নিকটে এসে উপস্থিত হননি দেখে।

বনহুর ড্রাইভ আসনের পাশে দাঁড়িয়ে রইলো, যেমনভাবে ড্রাইভারগণ দাঁড়িয়ে থাকে।

জজ সাহেবের আজ একটু বিলম্ব হয়ে গেছে, তিনি ব্যস্তভাবে গাড়ীতে এসে চেপে বসলেন।

ড্রাইভারও বসলেন তার আসনে।

নূতন ঝকঝকে মডেল পন্টিয়াক গাড়ীখানা দস্যু বনহুরের হস্তে উল্‌কা বেগে ছুটলো।

মাত্র কয়েক মিনিট, গাড়ী বড় রাস্তা ছেড়ে গলিপথে প্রবেশ করলো।

জজ সাহেব বললেন—জজকোর্টে যাবার পথ ভুল করলে কি?

পুরোন অভিজ্ঞ ড্রাইভার, কাজেই জজ সাহেব হাল্‌কা ভাবেই কথাটা বললেন।

বনহুর সম্মুখে দৃষ্টি রেখে বললো—বিলম্ব হয়ে গেছে, তাই পথ খাটো করে নেবার জন্যে....

বেশ তাই চলো। একটা সিগারেট বের করে সেটিতে অগ্নি সংযোগ করলেন জজ সাহেব।

গাড়ীখানা এখন নির্জন গলিপথ ধরে এগুচ্ছে। হঠাৎ ড্রাইভার-বেশি বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলো—জজ সাহেব, একটি কথা বলতে চেষ্টা করবেন না। করলেই এই দেখুন....রিভলভারখানা বের করে দেখায় সে—এর এক গুলীতে খতম করে দেবো, কাজেই চুপ করে সিগারেট সেবন করুন।

ড্রাইভারের কথায় জজ সাহেবের বুকটা ধক্ করে উঠলো, কম্পিত বক্ষ নিয়ে তাকালেন ড্রাইভারের বাম হস্তে-উদ্যত রিভলভারখানর দিকে, পর মুহূর্তে তাকালেন তার মুখে—কে তুমি?

বনহুর চাপা কণ্ঠে বললো—আমি কে একটু পরে বলবো!

আমাকে এভাবে তুমি কোথায় নিয়ে চলেছো?

একটু অপেক্ষা করুন, সব টের পাবেন। কিন্তু মনে রাখবেন একটু টু শব্দ করলেই মরবেন। আমি আপনার সাথে কোনো অন্যায় করবো না।

জজ এতোকাল কত শত শত ব্যক্তির ভাগ্য নিয়ে গবেষণা করে এসেছেন, আজ তার নিজের ভাগ্যে এও ছিলো! বুদ্ধিমান জজ সাহেব নিশ্চুপ থাকাই বাঞ্চনীয় মনে করলেন। কারণ চীৎকার করে কোনো ফল হবে না, শেষ পর্যন্ত মৃত্যুও ঘটতে পারে, কাজেই তাঁর আসনে চুপ করে বসে রইলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই একটি বিরাট বাড়ীর সম্মুখে এসে পৌছলো তাদের গাড়ী, আশেপাশে কোনো বাড়ী নেই। ড্রাইভারবেশী বনহুর ড্রাইভ্ আসনে বসেই নিজের মাথার ক্যাপটা খুলে, দারোয়ানের দিকে তাকিয়ে ইংগিৎ করলো।

দারওয়ান বনহুরকে দেখতে পেয়ে মুহূর্তে চিনে নিলো, এবং সঙ্গে সঙ্গে কুর্ণিশ করে সোজা গিয়ে দাঁড়ালো।

বনহুর গাড়ী থেকে নেমে গাড়ীর দরজা খুলে ধরলো—নেমে আসুন।

জজ সাহেব বাধ্য হলেন নেমে পড়তে।

দারওয়ান ফটক ধরলো, বনহুর আর জজ সাহেব প্রবেশ করলো ভিতরে।

এ বাড়ী দস্যু বনহুরের শহরের আস্তানা।

অনুচরগণ বহুদিন পর প্রভুকে ফিরে আসতে দেখে আনন্দে আপ্লুত হলো। সবাই কুর্নিশ জানিয়ে অভিনন্দন জানাতে লাগলো। সকলের মনেই প্রশ্ন—তাদের সর্দার এতদিন কোথায় ছিলেন, কিন্তু কেউ জিজ্ঞাসা করার সাহসী হলো না।

বনহুর জজ সাহেব সব পর পর কয়েকখানা কক্ষ পার হয়ে একটা কক্ষের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। কক্ষের দরজা ভিতর হতে বন্ধ, বাইরে কোনো তালা-চাবি বা ঐ ধরণের কোনো জিনিস নেই। বনহুর ওদিকে একটা সুইচে হাত রাখতেই দরজা আপনা হতে খুলে গেলো। জজ সাহেবকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর—আসুন ভিতরে।

জজ সাহেব দ্বিধা করছিলেন, বনহুর হেসে বললো—ভয় নেই, আপনার কোনো ক্ষতি হবে না।

জজ সাহেব বনহুরের সঙ্গে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন, আশ্চর্য হলেন এবার, কক্ষটা কোনো হলঘর বলে মনে হলো, কক্ষমধ্যে নীলাভ আলো জ্বলে উঠেছে দরজা খুলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে। জজ সাহেব দেখলেন, মেঝেতে সুন্দর দামী গালিচা বিছানো রয়েছে। মূল্যবান সোফাসেট থরে থরে সাজানো। মাঝখানে একটা মার্বেল পাথরের গোল টেবিল। টেবিলে কয়েকটা এ্যাসট্রে। একটা বড় ফুলদানীও রয়েছে টেবিলের মাঝখানে।

দেয়ালে কয়েকখানা ছবি, কিন্তু কোনো ব্যক্তির নয়। সব ক' খানাই হিংস্র জন্তুর তৈলচিত্র।

জজ সাহেব আরও অবাক হলেন—একটা আসন, ঠিক সিংহের মুখাকৃতি। সিংহের চোখ দুটো ঠিক জীবন্ত সিংহের ন্যায় জ্বলজ্বল করছে।

বনহুর সেই আসনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর সিংহের দক্ষিণ চোখে আঙ্গুলের চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে মেঝের একস্থানে একটা সুড়ঙ্গ পথ বেরিয়ে এলো।

বনহুর বললো—আসুন জজ সাহেব।

জজ সাহেব এবার কথা বললেন—আমাকে তুমি কি করতে চাও?

কিছু না। শুধু দু'চারটে প্রশ্নের জবাব দেবেন, আর দু'চারদিন আমার বিশ্রামকক্ষে বিশ্রাম করবেন—এই যা।

জজ সাহেব বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন তার মুখোভাবেই বোঝা গেলো। যদিও বনহুরের আশ্বাসবাণী তাঁকে কিছুটা আশ্বস্ত করেছে তবু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারেননি।

বনহুর বললো—বিলম্ব করবেন না, কারণ এখন প্রতিটি মুহূর্ত আমার অত্যন্ত মূল্যবান। আসুন আমার সঙ্গে।

বনহুর সুড়ঙ্গ মুখের দিকে অগ্রসর হলো।

অল্পক্ষণের মধ্যে বনহুর আর জজ সাহেব বিরাট একটি কক্ষে প্রবেশ করলো।

এ কক্ষটা মাটির নীচে তৈরী। কক্ষে স্বাভাবিক আলো জ্বলছে। দেয়ালটা সম্পূর্ণ পাথরে তৈরী, কোনো রঙের ছোয়া পড়েনি দেয়ালে। চারিদিকে অনেকগুলি পাথরে তৈরী ছড়ানো। ওদিকে একটু উঁচু আসন, আসনটা পাথরে তৈরী বলেই মনে হলো। আসনের পাশেই একটা গোলাকৃত উঁচু টেবিল। টেবিলে একখানা ছোরা গাঁথা রয়েছে।

ছোরাখানা যদিও সুতীক্ষ্ণ ধারালো কিন্তু এখন সেটা মরচে ধরে ঘোলাটে হয়ে উঠেছে।

বনহুরের শহুরে দরবারকক্ষ এটা।

বনহুর এ কক্ষে কত দিন পর আজ পা রাখলো তার কোনো সঠিক হিসাব নেই।

পাশাপাশি দু'খানা চেয়ারে বসলো বনহুর আর জজ সাহেব।

জজ সাহেব বার বার উদ্বিগ্নভাবে তাকাচ্ছে ড্রাইভারবেশী দস্যু বনহুরের মুখে। চোখেমুখে এখন তাঁর ভীতিভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বনহুর একবার নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে-নিলো, তারপর বললো—আপনাকে যা জিজ্ঞাসা করবো, সঠিক জবাব দেবেন তো?

দেবো। বললেন জজ সাহেব।

বনহুর সিগারেট কেস বের করে মেলে ধরলো জজ সাহেবের দিকে—নিন।

জজ সাহেবের এখন যে অবস্থা তাতে সিগারেট সেবন করাতো দূরের কথা, তিনি কোনোদিন সিগারেট সেবন করেছিলেন কিনা তাও তার স্মরণ নেই। বললেন—মাফ্ করো, সিগারেট সেবন করবোনা, বলো—কে তুমি?

আমি কে তা জানতে পারবেন, কিন্তু এখন নয় পরে। আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন, বলুন—দস্যু বনহুর এখন কোথায়?

দস্যু বনহুর!

হাঁ, বলুন?

এখন সে হাঙ্গেরী কারাকক্ষে বন্দী।

বিচারে তাকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছে?

হাঁ।

সে দন্ড কি আপনি দিয়েছেন?

হাঁ, তার অপরাধের জন্য তাকে বাধ্য হয়েছি মৃত্যুদন্ড দিতে। ৭ই জুন তাকে হাঙ্গেরী কারাকক্ষে ফাঁসী দিয়ে হত্যা করা হবে।

আর যদি সে দস্যু বনহুর না হয়?

বনহুরের কথায় জজ সাহেব চোখ তুলে তাকান তার মুখে, বলেন—কান্দাই এর পুলিশ সুপার মিঃ আহম্মদ নিজে তাকে গ্রেপ্তার করেছেন এবং দক্ষ পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ জাফরী তাকে সনাক্ত করে দস্যু বনহুর বলে প্রমাণ করেছেন।

তাহলে যে ব্যক্তি এখন হাঙ্গেরী কারাগারে আছে সে সুনিশ্চিত দস্যু বনহুর, তাতে কোনো সন্দেহ নেই?

না!

সে যদি দস্যু বনহুর না হয়?

উপযুক্ত প্রমাণ পেলে তাকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু যাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে—সে দস্যু বনহুর।

বেশ, আপনি আমার বিশ্রামকক্ষে কয়েকদিন বিশ্রাম করুন। তারপর আপনি মুক্তি পাবেন। এখানে আপনার কোনো অসুবিধা হবেনা। আসুন, পাশের কক্ষে আপনি থাকবেন......

বনহুর দক্ষিণ পাশের দেয়ালে একটা সুইচ টিপতেই দেয়ালটা ফাঁক হয়ে গেলো। বনহুর ভিতরে প্রবেশ করে আলো জ্বাললো। তারপর ডাকলো সে—আসুন এখানে।

জজ সাহেব বনহুরের কথামত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন। সুন্দর সুসজ্জিত বেড রুম, এক পাশে খাট, মাঝখানে টেবিল, পাশে একটা চেয়ার। সেলফে সাজানো নানা রকম বই।

এ কক্ষেই দস্যু বনহুর তার প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের সম্মানে আটকে রাখে।

জজ সাহেবকে আরও কয়েকটা মূল্যবান প্রশ্ন করার পর বনহুর বললো—আপনি এবার আপনার পরিচ্ছদ ত্যাগ করুন, ঐধারের আলমারীতে আপনার জন্য বিভিন্ন রকম পোষাক রয়েছে। ইচ্ছামত আপনি যা খুশি ব্যবহার করতে পারেন। একটু থেমে বললো—আপনার এই ড্রেসটা আমার এই মুহূর্তে প্রয়োজন। কিছু মনে না করে যদি খুলে দেন তাহলে আমি উপকৃত হবো।

জজ সাহেব দেখলেন,ওর কথামত কাজ না করে কোনো উপায় নেই। কাজেই তিনি পাশের আলমারী থেকে পাজামা আর পাঞ্জাবী বেছে নিলেন।

বনহুর বললো আবার—ওদিকে ছোট্ট কুঠরী আছে, আপনি ড্রেস পরিবর্তন করে আসুন।

জজ সাহেব দেখলেন, একটা দরজা রয়েছে ওদিকে—বাথ-রুম হবে। তিনি কাপড়গুলি হাতে নিয়ে প্রবেশ করলেন পাশের রুমে, দেখলেন কক্ষটা বাথরুমই বটে! সুন্দরভাবে আলো এবং পানির ব্যবস্থা রয়েছে। দেওয়ালে বেলজিয়াম আয়না, সাবান, তোয়ালে, চিরুণী, সেভের যন্ত্রপাতি—সব আছে তার মধ্যে।

জজ সাহেব তার পরিচ্ছদ ত্যাগ করে পরে নিলেন পাজামা আর পাঞ্জাবী। ঠিক্ মাপমত না হলেও একটুও অসুবিধা হলোনা।

বনহুর জজ সাহেবের পরিচ্ছদ হস্তে বিদায় গ্রহণ করলো। যাবার সময় বললো—যখন আপনার যা প্রয়োজন হবে, কলিং বেল টিপ্লেন আমার লোক আসবে, তাকে জানাবেন।

বনহুর বড় কক্ষটার পূর্বদিকের দেয়ালের পাশে এসে একটা সুইচে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে এ পাশেও বেরিয়ে এলো ঐ-রকম একটা দরজা—যেমন দক্ষিণ পাশের দেয়ালে। বনহুর এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো কক্ষমধ্যে। কক্ষটিতে প্রবেশ করতেই আলো জ্বলে উঠলো, তীব্র উজ্জ্বল আলো। বনহুরের ছদ্মবেশ ধারণের কক্ষ এটা। দেয়ালের চারপাশে আয়না, মাঝে মাঝে টেবিল বসানো রয়েছে, প্রত্যেকটা টেবিলে ছদ্রবেশের নানা-রকম আসবাবপত্র।

বনহুর কিছুক্ষণের মধ্যে নিজকে সম্পূর্ণ জজ সাহেবের রূপে সজ্জিত করে নিলো। নিজেই নিজকে দেখে অবাক হলো, এতোটুকু ভুল হয়নি কোথাও। জজ সাহেবের পোষাকটা একটু আটসাট হচ্ছিলো কিন্তু কোনো অসুবিধা হলোনা।

এবার বনহুর ঠিক প্রৌঢ় জজ সাহেব বনে গেছে!

বনহুর কলিং বেলে হাত রাখতেই দরজায় এসে দাঁড়ালো একজন অনুচর, প্রথম তাদের সর্দারকে চিনতে না পেরে ক্রুদ্ধ মূর্তি ধারণ করলো, রাইফেল উদ্যত করে ধরলো সে, দু'চোখে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

বনহুর তার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে ধরলো।

বনহুরের হস্তে একটি চিহ্নযুক্ত অংগুরী ছিলো। সে যখন ছদ্রবেশ ধারণ করতো তখন তার আংগুলে ঐ চিহ্নযুক্ত অংগুরী পরতো। কারণ সেই অংগুরী দেখামাত্র তার লোক তাকে চিনতে পারতো।

অনুচরটির দৃষ্টি বনহুর হস্তের আংগুলের অংগুরীতে পড়তেই উদ্যত রিভলভার নত করে নিয়ে কুর্ণিশ জানালো। বনহুর বললো তাকে লক্ষ্য করে—কাসেমকে পাঠিয়ে দাও।

চলে গেলো অনুচরটি, অল্পক্ষণেই এলো কাসেম। প্রভুকে তার চিনতে বিলম্ব হলো না, বললো সে—সর্দার, আদেশ করুন?

এই কক্ষে মেঝেতে যে ড্রাইভারের ড্রেস পড়ে রয়েছে সেই ড্রেস দ্রুত পরে নাও, জজকোর্টে যেতে হবে।

কাসেম দ্বিতীয়বার কোনো প্রশ্ন না করে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলো। যদিও কাসেমের কাছে সব আশ্চর্য লাগছিলো তবু নীরবে সর্দারের আদেশ পালন করে গেলো। অল্প সময়ের মধ্যেই কাসেম ড্রাইভারের ড্রেসে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে এলো।

জজ সাহেবের বেশে দস্যু বনহুর আর ড্রাইভারবেশী কাসেম এসে দাঁড়ালো গাড়ীখানার পাশে।

আদালত কক্ষ।

ডায়াসের ওপাশে উচ্চ আসনে জজ সাহেবের বেশে উপবিষ্ট স্বয়ং দস্যু বনহুর। চোখেমুখে তার সুস্পষ্ট বার্ধক্যের ছাপ।

শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ কক্ষমধ্যে নিজ নিজ আসনে বসে আছেন। সকলেরই চোখে মুখে একটা ভয়ঙ্কর উন্মাদনা। বিচারকক্ষ নীরব।

ডায়াসের সম্মুখস্থ আসনে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে উপবিষ্ট মিঃ আহম্মদ এবং আরও কয়েকজন পুলিশ অফিসার। মিঃ জাফরী দন্ডায়মান, তাঁর হস্তে দু'খানা চিঠি। তিনি চিঠি দু'খানা অত্যন্ত মনোযোগে দেখছিলেন।

কক্ষস্থ সকলের দৃষ্টি মিঃ জাফরীর মুখে সীমাবদ্ধ।

মিঃ জাফরী বেশ কিছুক্ষণ চিঠি দু'খানা লক্ষ্য করে বললেন—এ চিঠি দু'খানা একই হাতের লিখা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবার তিনি নিজ পকেট থেকে একখানা ছোট্ট পুরোন চিঠি বের করে মেলে ধরলেন হস্তস্থিত চিঠি দু'খানার পাশে, তারপর বললেন—এক বছর আগে দস্যু বনহুরের লিখা এই চিঠি। মিঃ জাফরী এবার তার হাতের তিনখানা চিঠিই এগিয়ে দিলেন জজ সাহেবের টেবিলে—মাইলড্, আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহে বলছি এই তিনখানা চিঠি একই হস্তের লিখা এবং দস্যু বনহুরের হস্তের—তাতে কোনো ভুল নেই।

জজ সাহেব তিনখানা চিঠি পাশাপাশি মেলে ধরে নিপুণ দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগলেন, তারপর গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—হাঁ, আপনার অনুমান সত্য। এই তিনখানা চিঠি একই হস্তের লিখা। প্রথমখানা লিখা হয়েছে আমাকে, দ্বিতীয়খানা মিঃ আহম্মদকে, আর তৃতীয়খানা এক বছর পূর্বে মিঃ জাফরীকে।

বিচারকক্ষ নীরব নিস্পন্দ। প্রত্যেকেই বিপুল আগ্রহে তাকিয়ে আছে জজ সাহেবের মুখে। দস্যু বনহুরের মৃত্যুদন্ডাদেশের পর হঠাৎ এই অভিনব চিঠির উদ্ভব!

জজ সাহেব প্রথম চিঠিখানা হাতে তুলে নিয়ে উচ্চকণ্ঠে বললেন—এই চিঠিখানা দস্যু বনহুর আমাকে লিখেছে। আমি পড়ে শোনাচ্ছি। চিঠিখানা পড়তে শুরু করলেন—

"সম্মানিত বিচারপতি—

আপনি সুদক্ষ বিচারক হয়ে এত বড় ভুল
করে গেছেন যা অতি অসত্য। যাকে
আপনি দস্যু বনহুর ভ্রমে মৃত্যুদন্ডাদেশ
দিয়েছেন সে দস্যু বনহুর বা তার
কোনো অনুচর নয়। কাজেই তাকে
পুনরায় ভালভাবে সনাক্ত করার জন্য
অনুরোধ জানাচ্ছি।

আপনাদের মঙ্গলপ্রার্থী
—দস্যু বনহুর

প্রথম চিঠিখানা পড়া শেষ হলে ভাঁজ করে রেখে দ্বিতীয় চিঠিখানা তুলে নিলেন জজ সাহেব হাতে।

বিচারকক্ষ মধ্যে একটা গুঞ্জনধ্বনি উঠেছে, সকলেই বিস্ময়ভরা কণ্ঠে একে অপরকে বলছেন, "দস্যু বনহুর তাহলে মুক্ত আছে!" বহু লোকের মিলিত কণ্ঠে কক্ষটা গম গম করে উঠলো।

জজ সাহেব টেবিলে আঘাত করে সবাইকে চুপ হবার জন্য নির্দেশ দিলেন।

আবার বিচারকক্ষ নীরব হলো।

জজ সাহেব এবার দ্বিতীয় চিঠিখানা সম্মুখে মেলে ধরে বললেন—এটা লিখা হয়েছে পুলিশ সুপার মিঃ আহম্মদের নিকটে। আমি পড়ছি—

"মিঃ আহম্মদ, আপনি
অভিজ্ঞ পুলিশ হয়ে এতো বড়
একটা সাংঘাতিক ভুল করেছেন
ভাবতেও আমার হাসি পায়। দস্যু
বনহুরকে আপনি বহুবার দেখা
সত্ত্বেও এমন ভুল করা আপনার
মত বিজ্ঞজনের শোভা পায় না।
যাকে আপনি মন্থনা দ্বীপের পূর্ব-

দক্ষিণ বনাঞ্চলে গ্রেপ্তার করেছেন
সে দস্যু বনহুর নয়। একজন
নিরপরাধী, দস্যু বনহুর ভ্রমে মৃত্যু
বরণ করলে আমি তা সহ্য করতে
পারবো না। কাজেই সাবধান"
—দস্যু বনহুর

চিঠি দু'খানা পড়া শেষ করে তাকালেন জজ সাহেব দন্ডায়মান মিঃ জাফরীর মুখে, তারপর বললেন—যতদূর সম্ভব মনে হচ্ছে দস্যু বনহুর এখনও মুক্ত রয়েছে। এ চিঠি দু'টি যে দস্যু বনহুরের হস্তের লিখা তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে।

মিঃ জাফরী বললেন—মাইলড্, আমারও সেই রকম মনে হচ্ছে। তাছাড়া বন্দীব্যক্তি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব সময় নিজকে দস্যু বনহুর বলে অস্বীকার করে এসেছে।

জজ সাহেব পুনরায় বললেন— আমার মতে যে ব্যক্তি দস্যু বনহুরকে ভালভাবে চেনেন তিনি সনাক্ত করবেন।

বিচারকক্ষে আবার গন্ডগোল হলো।

জজ সাহেব আবার টেবিলে রোলারের আঘাত করে থামিয়ে দিলেন।

সেদিনের মত বিচারসভা ভঙ্গ হলো।

জজ সাহেব তার গাড়ীতে গিয়ে বসলেন।

ড্রাইভার গাড়ী ছাড়লো।

মিঃ আহম্মদ, মিঃ জাফরী ও আরও দু'চারজন অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার দস্যু বনহুরের কারাকক্ষের দরজায় উপস্থিত হলেন।

মিঃ আহম্মদ মিঃ জাফরীকে লক্ষ্য করে বললেন—মিঃ জাফরী, আপনিই আমার চেয়ে বেশি দস্যু বনহুরকে চেনেন, কাজেই আপনি সনাক্ত করবেন।

ইয়েস স্যার, আমি তাকে ভালভাবে লক্ষ্য করলেই চিনতে পারবো। বললেন জাফরী।

দস্যু বনহুরের কক্ষের দরজা মুক্ত করা হলো। কক্ষে প্রবেশ করলেন মিঃ আহম্মদ ও মিঃ জাফরী। পুলিশ অফিসারদ্বয় কারাকক্ষে প্রবেশ করতেই করাকক্ষের লৌহদরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেলো। মিঃ আহম্মদ এবং মিঃ জাফরী উন্মুক্ত রিভলভার হস্তে বন্দী যুবকের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন।

বন্দী যুবক তখন মেঝেতে এক পাশে দেয়ালে ঠেশ দিয়ে বসে আছে, মুখমন্ডল মলিন বিবর্ণ ফ্যাকাশে, চোখ দু'টো বসে গেছে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি জম্মেছে। চুলগুলো এলোমেলো তৈলহীন। তবুও যুবকের চেহারা সুন্দর

সুঠাম দৃষ্টিতে এক মোহময় চাহনী। প্রশস্ত ললাট দীপ্ত উজ্জ্বল। দস্যু বনহুরের চেরারার সঙ্গে হুবহু মিল যুবকের।

মিঃ জাফরী এবং মিঃ আহম্মদ রিভলভার ঠিক রেখে তার পাশে দাঁড়ালেন।

বন্দী যুবক উঠে দাঁড়ালো।

মিঃ আহম্মদ বললেন—দস্যু, আর দু'দিন পর তোমার মৃত্যু।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো যুবক মিঃ আহম্মদের দিকে, কিছু বলতে চাইলো কিন্তু পারলোনা।

মিঃ আহম্মদ আবার বললেন—মৃত্যুর পূর্বে তুমি কাকে দেখতে চাও? বলো শেষবারের মত তাকে আমরা তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেবো।

মিঃ আহম্মদ যখন বন্দীকে পর পর প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন তখন মিঃ জাফরী তীক্ষ্ণভাবে বন্দীর মুখোভাব লক্ষ্য করছিলেন। তিনি আরও কয়েকবার বনহুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ করবার সুযোগ পেয়েছেন, কাজেই আজ তিনি বন্দীর মুখোভাবে তাকে সনাক্ত করার চেষ্টা করছিলেন। মিঃ জাফরী জানেন— দস্যু বনহুর কোনো সময় ভীতভাব প্রকাশ করতে জানেনা। যত বিপদই আসুক তার চোখেমুখে এক হিংস্র ভাব পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

মিঃ আহম্মদের প্রশ্নে বন্দী ঢোক গিলে বললো—আমি দস্যু বনহুর নই। তাকে আমি কোনোদিন চোখে দেখিনি। বিনা অপরাধে আমার মৃত্যুদন্ড হলে আমি ঈশ্বরের নিকটে অভিযোগ করবো। আমাকে আপনারা যা খুশী করুন, চাইনে আমি কাউকে দেখতে বা কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

এবার মিঃ জাফরী বললেন—স্যার, ওদিকে চলুন।

মিঃ আহম্মদ এবং মিঃ জাফরী কারাগারের এক পাশে সরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

মিঃ জাফরী বললেন—স্যার, আমার বিশ্বাস—এ ব্যক্তি দস্যু বনহুর নয়। তবে দস্যু বনহুরের সঙ্গে এর চেহারা এবং কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত মিল আছে। যার জন্য আমাদের এ ভুল হয়েছে।

মিঃ জাফরীর কথায় মিঃ আহম্মদের ভ্রূ কুঞ্চিত হলো, তিনি বললেন—মিঃ জাফরী, আপনি জানেন—দস্যু বনহুর কত বড় দুর্দান্ত। সে যে কোনো সময় নিজের রূপ পাল্টাতে অদ্বিতীয়। এ ব্যক্তি দস্যু বনহুর নয় প্রমাণ করার পূর্বে তাকে আরও ভালভাবে সনাক্ত করা দরকার।

মিঃ জাফরী কিছু ভাবলেন, তারপর বললেন—স্যার, এখন চলুন, আবার বিকেলে আসবো।

কারাকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন পুলিশ নায়কদ্বয়।

গাড়ীতে বসে বললেন মিঃ জাফরী—স্যার, একবার চৌধুরী বাড়ী যেতে হবে।

চৌধুরী বাড়ী, মানে?

দস্যু বনহুরের স্ত্রী মনিরা দ্বারা তার স্বামীকে সনাক্ত করতে হবে।

ঠিক বলেছেন মিঃ জাফরী, অদ্ভুত আপনার বুদ্ধিবল!

কিন্তু প্রকাশ্যে তাকে জানতে দেওয়া হবে না যে তার দ্বারা আমরা তার বন্দী স্বামীকে সনাক্ত করতে নিয়ে যাচ্ছি। তাকে জানানো হবে তার স্বামীর মৃত্যুদন্ডের পূর্বে তাকে শেষবারের মত তার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

অতি উত্তম। বেশ, সেইভাবেই কাজ করা হবে। তাহলেই বোঝা যাবে সব।

হ্যাঁ স্যার, স্ত্রী কোনোদিন স্বামীকে চিনতে ভুল করবে না।

ঠিক বলেছেন, স্ত্রী আর জননী এই দু'জন তাদের আপন স্বামী এবং সন্তানকে কখনও চিনে নিতে ভুল করেননা।

ড্রাইভারকে চৌধুরী বাড়ী যাওয়ার জন্য বললেন মিঃ আহম্মদ।

গাড়ীখানা কালাবাগ রোড দিয়ে দ্রুত অগ্রসর হলো জান্নবী রোডের দিকে। হাঙ্গেরী রোড ছেড়ে চলে এসেছে অনেক দূরে।

চৌধুরী বাড়ীর গেটে গাড়ী পৌছতেই সরকার সাহেব পুলিশ অফিসারদ্বয়কে অভ্যর্থনা করে হলঘরে নিয়ে বসালেন। ভদ্র মহোদয় দু'জনকে বসিয়ে ছুটলেন তিনি উপরে, বেগম সাহেবা আর মনিরাকে জানালেন পুলিশ অফিসারদ্বয়ের আগমনবার্তা।

অফিসারদ্বয়ের আগমন-সংবাদ শুনে আশ্চর্য না হলেও আশঙ্কিত হলেন মরিয়ম বেগম, না জানি আবার কোনো ব্যাপার নিয়ে এসেছেন তারা।

কিন্তু মনিরা নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত স্থির।

সরকার সাহেবকে লক্ষ্য করে বললো মনিরা—চলুন আমি যাচ্ছি।

মরিয়ম বেগম বাধা দিয়ে বললেন—মনিরা, তুমি অপেক্ষা করো, আমি বরং শুনে আসি।

মনিরা বললো—মামীমা, এ তুমি কি বলছো আজ? কোনো-দিন তুমি কারো সঙ্গে দেখা করতে যাওনা, আর... ....

মা, আবার কি অভিসন্ধি নিয়ে যে তাঁরা এসেছেন কে জানে। আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে।

গম্ভীর গলায় বললো মনিরা—কোনো চিন্তা করোনা মামীমা, বিপদের সঙ্গে মোকাবেলা করে আমি শক্ত হয়ে গেছি। আমার স্বামী আজ মৃত্যুদন্ডে

দন্ডিত, ভয় কাকে বলে জানিনে। স্বামীর জন্য আমি সব কিছু করতে প্রস্তুত আছি!

ওঁনারা কেনো এসেছে কিছুই তো জানিসনে মা?

জানিনে, তবে জানবার জন্যই যাচ্ছি। চলুন সরকার সাহেব। মনিরা সিড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলো, সরকার সাহেব অনুসরণ করলেন তাকে।

মনিরা কক্ষে প্রবেশ করে সোজা মিঃ জাফরী ও মিঃ আহম্মদের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো—বলুন, অসময়ে কি প্রয়োজন আমার কাছে আপনাদের?

মিঃ জাফরী বললেন—বসুন মিসেস মনিরা!

বসতে হবে না, বলুন?

মিসেস মনিরা, আপনি জানেন—আপনার স্বামী হাঙ্গেরী কারাগারে আবদ্ধ। শুধু আবদ্ধই নয়—তার মৃত্যু-দন্ডাদেশ ঘোষণা করা হয়েছে।

শুনেছি, কিন্তু আপনারা কি কষ্ট করে আমাকে ঐ সংবাদ জানাতেই এসেছেন?

শুধু ঐ সংবাদ জানানোর জন্যেই আমরা আসিনি। হাজার হলেও আপনি তার স্ত্রী। দস্যু বনহুরকে মৃত্যুদন্ড দেবার পূর্বে তাকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম কাউকে সে দেখতে চায় কিনা।

আমার স্বামী তাহলে আমাকেই দেখবেন বলে জানিয়েছেন?

হাঁ, ঐ রকম বাসনা সে করেছে।

বেশ, আমি যাবো। কিন্তু আমি জানি—আমার স্বামী কোনো সময় কাউকে শেষ বারের মত দেখতে চান না। মনিরা এবার সরকার সাহেবকে বললেন—ড্রাইভারকে গাড়ী বের করতে বলুন। চলে গেলো মনিরা। মিঃ আহম্মদ এবং মিঃ জাফরী একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিলেন।

অল্পক্ষণ পর মনিরা তৈরী হয়ে ফিরে এলো, মিঃ জাফরী এবং মিঃ আহম্মদকে লক্ষ্য করে বললো—চলুন।

গাড়ী-বারেন্দায় সরকার সাহেব গাড়ী নিয়ে মনিরার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। পাশে দাঁড়িয়ে পুলিশ কার।

মনিরা এবং পুলিশ অফিসারদ্বয় এসে পৌছলেন।

মনিরা গাড়ীর দিকে এগিয়ে যেতেই ড্রাইভার গাড়ীর দরজা খুলে ধরলো, মনিরা উঠে বসতেই সরকার সাহেব ড্রাইভ আসনের পাশের সীটে উঠে বসলেন।

অফিসারদ্বয় উঠে বসলেন তাদের পুলিশ কারে।

হাঙ্গেরী কারাগারে পৌছতে সম্পূর্ণ দিনটাই লেগে গেলো তাদের। সন্ধ্যার পূর্বে তারা পৌছলো হাঙ্গেরী কারাগারের লৌহফটকের মধ্যে। পুলিশ

অফিসারদ্বয় থাকায় পুলিশগণ মনিরাদের গাড়ীও ছেড়ে দিলো বিনা আপত্তিতে।

হাঙ্গেরীর প্রাচীর ঘেরা ময়দানে গাড়ী রেখে নেমে পড়লেন মিঃ আহম্মদ এবং মিঃ জাফরী। মনিরাকেও নামার জন্য তাঁরা অনুরোধ করলেন।

মনিরা এবং সরকার সাহেব নেমে পড়লেন।

মিঃ জাফরী বললেন—মিসেস মনিরা, শুধু আপনিই যেতে পারবেন।

মনিরা সরকার সাহেবকে লক্ষ্য করে বললো—সরকার চাচা, আপনি অপেক্ষা করুন। চলুন ইন্সপেক্টার সাহেব।

মিঃ আহম্মদ, মিঃ জাফরী এবং জেলার সাহেব সহ মনিরা অগ্রসর হলো হাঙ্গেরী কারাকক্ষের দিকে। মনিরার দু'চোখে বিস্ময়, এতোদিন হাঙ্গেরী কারাকক্ষের নাম সে শুনে এসেছে আজ স্বামীর কল্যাণে স্বচক্ষে দেখবার সৌভাগ্যলাভ তার ঘটলো। মনিরার অন্তরে আলোড়ন চলেছে, তার স্বামী আজ মৃত্যুপথের যাত্রী। আজ ৫ই জুন, ৭ই জুনে তার স্বামীর ফাঁসী হবে এই হাঙ্গেরী কারাকক্ষের এক নিভৃত কক্ষে।

মনিরার বুক ফেটে গেলেও সে মুখোভাবে বেদনা বয়ে আনলোনা। অতি কষ্টে নিজকে সংযত রেখে এগুতে লাগলো পুলিশ অফিসারত্রয়ের সঙ্গে।

পরপর অনেকগুলি ফটক পেরিয়ে এগিয়ে চললো তারা। প্রত্যেকটা ফটকে চারজন করে রাইফেলধারী পুলিশ দন্ডায় মান। চারিদিক শুধু পুলিশ আর পুলিশ। প্রত্যেক পুলিশ হস্তে আগ্নেয় অস্ত্র।

প্রায় বারোটি তালাযুক্ত কক্ষ পেরিয়ে একটি লৌহদরজা বিশিষ্ট কক্ষের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন জেলার সাহেব, মিঃ আহাম্মদ ও মিঃ জাফরীও দাঁড়ালেন পাশাপাশি।

মনিরাও তাদের সম্মুখে রয়েছে।

জেলার সাহেব স্বয়ং কারাকক্ষের দরজা মুক্ত করলেন।

মনিরার বুকটা তখন ধক্ ধক্ করছিলো। তার মনে হচ্ছিলো—নাজানি কি অবস্থায় আজ স্বামীকে সে দেখবে। মনিরা অতি কষ্টে নিজকে সংযত রেখে পুলিশ অফিসারত্রয়ের পিছনে কারাকক্ষে প্রবেশ করলো। পা দু'খানা যেন পাথরের মত ভারী মনে হচ্ছিলো তার। স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে কিন্তু মনে এতোটুকু শান্তি পাচ্ছে না সে। সম্মুখে তাকাতে সাহস হচ্ছিলো না মনিরার। কারাগারে বন্দী অবস্থায় তাকে কেমন দেখায় কোনোদিন দেখেনি, ভয় হচ্ছিলো—যদি সে স্বামীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কান্নায় ভেংগে পড়ে, কিছুতেই যদি নিজকে সংযত রাখতে না পারে তখন কি হবে। সে একজন সাধারণ বন্দীর স্ত্রীর মত আকুল হয়ে কাঁদবে! না না তা হয় না, নিজকে মনিরা কঠিন করে নিলো।

মিঃ জাফরীর কথায় চোখ তুললো মনিরা।

মিঃ জাফরী মনিরাকে লক্ষ্য করছিলেন, বললেন—চোখ তুলুন মিসেস মনিরা।

মনিরা চোখ তুললো, সম্মুখে দৃষ্টি পড়তেই দু'পা এগিয়ে গেলো, কিন্তু পরমুহূর্তেই থেমে পড়লো সে।

মিঃ জাফরী মিঃ আহম্মদ এবং জেলার সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন।

বন্দী যুবক মনিরার দিকে অপরিচিত দৃষ্টি নিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে। মনিরাও নির্বাক হয়ে তাকিয়ে আছে, তার চোখে যেন রাজ্যের বিস্ময়।

কিছুক্ষণ কেটে গেলো, কারো মুখে কোনো কথা নেই।

এবার মিঃ জাফরী বললেন—মিসেস মনিরা, আপনার স্বামীকে চিনতে কষ্ট হচ্ছে আপনার?

মনিরার দৃষ্টি এবার ফিরে গেলো মিঃ জাফরীর মুখে, স্থির কণ্ঠে বললো মনিরা —আমি জানতাম আমার স্বামী কোনদিন মৃত্যুকালে তার পরম জনকে দেখতে চাইবেন না। যাকে আমার স্বামী বলে আপনারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন সে আমার স্বামী নয়।

এক সঙ্গে সবাই তাকালো বন্দী যুবকের দিকে, তারপর মনিরার দীপ্ত উজ্জ্বল মুখের দিকে।

মনিরা বললো—বিনা দোষে আপনারা এক নিরপরাধ জনকে হত্যা করতে যাচ্ছিলেন, আশ্চর্য আপনাদের দৃষ্টিবল। আজ এই যুবকের চেহারা যদিও হুবহু আমার স্বামী দস্যু বনহুরের মত, কিন্তু তার কি ললাটের পাশে কোনো তিল ছিলো?

এতোক্ষণে মিঃ আহম্মদ এবং মিঃ জাফরী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালেন বন্দী যুবকের ললাটে। তাই তো বন্দীর ললাটের বামপাশে একটি তিল আছে, বনহুরের এমন কোনো তিল ছিলো না।

মনিরা বললো আবার—এ যুবক আমার স্বামী নয়। আমার স্বামীর দক্ষিণ বাহুতে একটি বড় জট চিহ্ন আছে।

সঙ্গে সঙ্গে মিঃ জাফরী বন্দী যুবকের দেহ থেকে জামাটা খুলে ফেলার জন্য বললেন।

যুবক কথামত জামা খুলে ফেললো তার দেহ থেকে। শুধু মনিরাই নয়, আর সবাইও দেখলো—তার দক্ষিণ বাহুতে কোনো রকম জট চিহ্ন বা ঐ ধরনের কোনো কিছু নেই।

মনিরার মুখোভাব আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, বন্দী যুবক তার স্বামী নয়। তার স্বামী তাহলে গ্রেপ্তার হয়নি। বললো মনিরা—এবার যেতে পারি?

হাঁ চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। মিঃ জাফরী বললেন।

মনিরা বেরিয়ে এলো কারাগার কক্ষ হতে।

অদূরে গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন সরকার সাহেব।

মনিরা দীপ্ত উজ্জ্বল আনন্দভরা মুখে গাড়ীর দিকে অগ্রসর হলো।

❑

পরদিন।

আদালত কক্ষের বাইরে আজ লোকে লোকারণ্য। এতোটুকু তিলমাত্র স্থান নেই সম্মুখস্থ ময়দানটায়। কক্ষমধ্যেও তেমনি ভীড়।

জজ সাহেব আসনে উপবিষ্ট।

ডায়াসের পাশে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সেই বন্দী যুবক, যাকে মিঃ আহম্মদ দস্যু বনহুর ভ্রমে গ্রেপ্তার করেছিলেন। ৭ই জুন যার মৃত্যুদন্ডাদেশ ঘোষণা হয়েছিলো। মন্থনার রাজকুমার প্রদীপ আজ কান্দাই বিচারালয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দন্ডায়মান।

বিচারকক্ষে প্রতিটি লোক তাকিয়ে আছে আসামীর দিকে। সকলেরই চোখে মুখে বিস্ময়, দস্যু বনহুর এ নয় কিন্তু তাকে দস্যু বনহুর ভ্রমে গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো।

বিচারকক্ষ নীরব।

সম্মুখস্থ আসনগুলিতে বসে আছে শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। মিঃ আহম্মদ, মিঃ জাফরী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসারগণ।

কক্ষমধ্যে একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছে।

জজ সাহেব এবার গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন—আদালত বন্ধ থাকায় আমি দু'দিন কান্দাই এর বাইরে গিয়েছিলাম কোনো এক জরুরী কাজে। আজ ফিরে এসে জানতে পারলাম মিঃ আহম্মদ এবং মিঃ জাফরী তাদের বন্দী আসামী সম্বন্ধে সনাক্ত কাজ শেষ করেছেন। কারণ আসামী দস্যু বনহুর নয়।

আদালতকক্ষ করতালিতে মুখর হয়ে উঠলো।

জজ সাহেব পুনরায় বললেন—আসামী যদিও নিজকো প্রথম থেকেই দস্যু বনহুর বলে অস্বীকার করে এসেছে কিন্তু সে এখনও তার নিজস্ব পরিচয় আদালতের নিকটে পেশ করেনি। আমি আবার তাকে তার নিজস্ব পরিচয় দান করার জন্য বলছি।

প্রদীপ বলে উঠলো—আমি আমার পরিচয় দিতে রাজি নই।

আদালতকক্ষে একটা গুঞ্জনধ্বনি উঠলো। হয়তো সবাই জানতে চাইলো—কে এই যুবক।

জজ সাহেব টেবিলে হাতুড়ীর আঘাত করে সবাইকে থামিয়ে দিলেন। তারপর বললেন—যুবক তার পরিচয় দিতে ইচ্ছুক নয়, কাজেই তাকে প্রশ্ন না করাই শ্রেয়। আসামী নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে মুক্তি দেওয়া হলো।

আদালতকক্ষ আবার আনন্দ ধ্বনিতে ভরে উঠলো।

মন্থনার রাজকুমার প্রদীপ মুক্তিলাভ করার পর বেরিয়ে এলো মুক্ত আকাশের তলে। কিন্তু কোথায় যাবে সে, কান্দাই এর পথঘাট সব তার অপরিচিত।

জনতার ভীড়ে নিজকে আড়াল করে দিকহীনভাবে অগ্রসর হচ্ছিলো প্রদীপ। হঠাৎ পাশে গাড়ী থামার শব্দে ফিরে তাকালো সে। বিস্মিত হলো, জজ সাহেবের গাড়ী এসে থেমে পড়েছে তার পাশে।

প্রদীপ তাকাতেই স্বয়ং জজ সাহেব তাকে আহ্বান জানালেন—আসুন আমার গাড়ীতে।

বিস্ময়ের পর বিস্ময় জাগলো প্রদীপের মনে, জজ সাহেব তাকে আহ্বান জানাচ্ছেন—কিন্তু কেনো? আবার তাকে বন্দী করা হবে?

প্রদীপকে চিন্তা করতে দেখে বললেন জজ সাহেব—চিন্তার কোনো কারণ নেই, আসুন আপনাকে আপনার স্বদেশে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবো।

এবার প্রদীপ কতকটা যেন আশ্বস্ত হলো। ধীরে পদক্ষেপে গাড়ীতে উঠে বসলো।

সেই বাড়ী।

বনহুরের শহরের আস্তানা।

জজ-বেশি দস্যু বনহুর প্রদীপ কুমার সহ বাড়ীটার ভিতরে প্রবেশ করলো।

প্রদীপ সহ একেবারে আসল জজ সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করলো বনহুর। তার দেহে তখনও জজ সাহেবের ছদ্মবেশ রয়েছে। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতেই জজ সাহেব বিস্ময়ে চমকে উঠলেন ঠিক্ তারই মত একজন ব্যক্তিকে তার কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে।

জজ সাহেবের বিস্ময় ঘোর কাটেনি বনহুর হেসে বললো— আপনি নিশ্চয়ই এখনও সম্পূর্ণ ব্যাপারখানা বুঝে উঠতে পারেননি। আমি সব বলছি শুনুন।

জজ সাহেব তখনও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন জজ সাহেব-বেশি দস্যু বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর বললো—প্রথম এর পরিচয় আপনার দরকার, এই যুবকই দস্যু বনহুর ভ্রমে গ্রেপ্তার হয়েছিলো এবং বিচারে তার মৃত্যু দন্ডাদেশও প্রদান করা হয়েছিলো কিন্তু সে ভুল আমি কার্যকরী হতে দেইনি। এবার বনহুর তার নিজ মুখ থেকে নকল দাড়ি গোঁফ খুলো টেবিলে রাখলো। তারপর মাথার নকল চুল খুলতে খুলতে বললো—এবং সেই কারণেই আমি বাধ্য হয়েছিলাম আপনাকে কয়েক দিনের জন্য আটকে রাখতে। কাজ সমাধা হয়েছে—এখন আপনি মুক্ত। যাকে আপনি বিচারে মৃত্যুদন্ড দিয়েছিলেন সে দস্যু বনহুর নয়—দস্যু বনহুর আমি!

এক সঙ্গে চমকে উঠলো জজ সাহেব আর প্রদীপ কুমার।

জজ সাহেব অবাক কণ্ঠে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন—তুমি দস্যু বনহুর!

হাঁ, আমিই দস্যু বনহুর।

প্রদীপ তখন বিস্ময় ভরা নয়নে তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখে, সত্যিই সে-ও আশ্চর্য হয়ে গেছে ওর চেহারার হুবহু মিল দেখে।

বনহুর জজ সাহেবকে লক্ষ্য করে বললো—কিন্তু একটি কথা আপনি স্মরণ রাখবেন, এই ব্যাপারটা যেন কোনো সময় কাউকে জানাবেন না। মানে, আপনার ছদ্মবেশে আমি আদালতের সামনে উপবিষ্ট হয়ে আপনার কাজ করেছি। এতে আপনার কোন লাভ হবেনা বরং আপনি লোকসমাজে লজ্জিত এবং হেয় পরিগণিত হবেন। আবার আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এ ব্যাপার নিয়ে নিশ্চুপ থাকাই আপনার মঙ্গল হবে। বনহুর পাশের কক্ষে প্রবেশ করে জজ সাহেবের ড্রেস পরিবর্তন করে ফিরে এলো—নিন, আপনি এবার পাশের ঘরে গিয়ে আপনার ড্রেস পরে নিন। আপনার গাড়ী বাইরে অপেক্ষা করছে, আমার ড্রাইভার আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। কিন্তু সাবধান আমার ড্রাইভারের কোনো রকম ক্ষতি করার চেষ্টা করবেন না।

না না, তুমি তো আমার কোনো ক্ষতি করনি।

হাঁ, আমি আপনার কোনো ক্ষতি করিনি। নির্দোষ একটি প্রাণ অকালে যাতে নিভে না যায় তাই আমি বাধ্য হয়েছিলাম এ কাজ করতে। যান, পাশের ঘরে গিয়ে আপনি নিজ ড্রেস পরিধান করে নিন।

জজ সাহেব পাশের ঘরে চলে গেলেন।

প্রদীপ কুমার অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে, চোখে তার রাশিকৃত বিস্ময়।

বনহুর এবার ফিরে তাকালো, একটু হেসে বললো—প্রদীপ কুমার, আপনি এখন ওদিকের কুঠরীতে গিয়ে নিজকে পরিস্কার করে নিন। মানে মুখের আবর্জনাগুলো চেঁছে ফেলে, আপনার ইচ্ছামত পরিচ্ছদ পরে নিন। যান ঐ যে দরজা দেখছেন, ওটার মধ্যে সব পাবেন।

প্রদীপ কুমারের বিস্ময় এখনও কাটেনি, তবু সে চলে গেলো পাশের কুঠরীর মধ্যে।

জজ সাহেবকে তার গাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলো বনহুর।

ততক্ষণে প্রদীপ কুমার তার মুখের খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ পরিস্কার করে নিয়ে সম্পূর্ণ কালো ড্রেস পরে ফিরে এলো।

বনহুর আনন্দধ্বনি করে উঠলো। জড়িয়ে ধরলো সে প্রদীপ কুমারকে বুকে।

বনহুর প্রদীপের মত কালো ড্রেস পরে নিলো। আয়নার সম্মুখে দাঁড়ালো ওরা দু'জন। আশ্চর্য হলো বনহুর—প্রদীপের চেহারার সঙ্গে তার চেহারা সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। হাসলো বনহুর, আপন মনেই বললো সে----মীরার কি দোষ!

❑

হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভেংগে গেলো, মীরা চোখ মেলে তাকাতেই বিস্ময়ে আড়ষ্ট হলো। এ কি! সে স্বপ্ন দেখছে না জেগে আছে, একটি নয় দু'টি প্রদীপ কুমার দাঁড়িয়ে তার শিয়রে।

বিছানায় উঠে বসলো মীরা, দু'চোখে তার বিস্ময়। অস্ফুট কণ্ঠে বললো—আমি কি স্বপ্ন দেখছি।

হেসে বললো দস্যু বনহুর—মীরা, স্বপ্ন নয় বাস্তব। তুমি না একজন প্রদীপকে হারিয়েছিলে, তাই দু'জন প্রদীপকে তুমি ফিরে পেলে। কিন্তু একজন আসল অপরজন নকল। কে আসল, তুমি বেছে নাও।

পরবর্তী বই

আফ্রিকার জঙ্গলে দস্যু বনহুর